তীর্থ-মুকুর

অর্থাৎ

৺ কাশীধাম, গয়াধাম, বৈদ্যনাথধাম, প্রয়াগ, অযোধ্যা,
নৈমিষারণ্য, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, পুষ্কর, হরিদ্বার,
কনখল, চণ্ডীর পাহাড়, চন্দ্রনাথ, বদরিকা-
শ্রম, জগন্নাথ, কামাখ্যা প্রভৃতি
তীর্থস্থানের প্রতি-
বিম্ব গ্রন্থ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা বাগচী কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।
বলিহার রাজধানী ছোট তরফ।

কলিকাতা,
চারু মুদ্রণ যন্ত্রে
বঙ্গাব্দ ১৮৯৯।
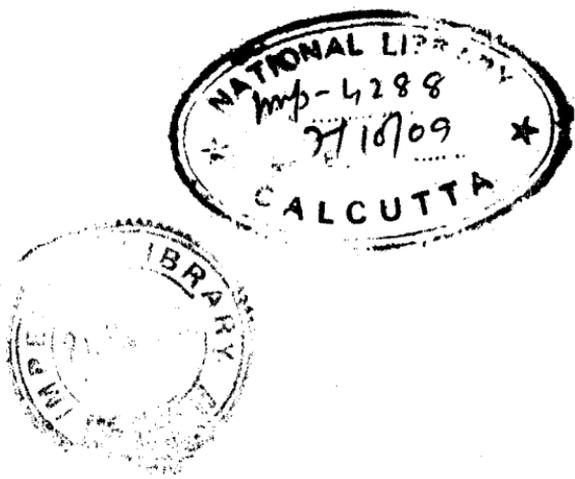
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চারু মুদ্রণ যন্ত্রে

৩/৪ গৌরমোহন মুখুয্যের ষ্ট্রীট,
সিমলা, কলিকাতা।

ভূমিকা।

অধুনা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই রেলওয়ের গাড়ীতে যাতায়াত করার সুবিধা হওয়ায়, অধিকাংশ ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ সমুদায় তীর্থ স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু তীর্থ স্থান সম্বন্ধীয় এরূপ এক খানি পুস্তক নাই, যাহাতে ঘরে বসিয়াই সকল তীর্থ স্থানের বিবরণ জানা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ঐ বিষয় পূর্ব্বে না জানা হেতু নূতন তীর্থ যাত্রীগণ পাণ্ডাদিগের চক্রে ও কুহক জালে পতিত হইয়া অযথা অর্থ ব্যয় করতঃ পথের সম্বল পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া বহু কষ্টে ঋণগ্রহণ করণানন্তর প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। এই অভাব দূরীকরণ মানসে ও সাধারণের হিতার্থে আমি নানা তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করত এবং কাশীখণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক এই পুস্তক প্রণয়ন করিলাম। ইহাতে ৺ কাশীধাম, গয়াধাম, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, পুষ্কর, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, চণ্ডীর পাহাড় কনখল, বদরিকাশ্রম, পুরুষোত্তম, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থানের তীর্থ কৃত্যাদি সম্বন্ধীয় বিবরণ সবিস্তর বর্ণিত হইল। এই পুস্তক পাঠে নূতন তীর্থ যাত্রীগণ কিঞ্চিৎ উপকার বোধ করিলে এবং বিজ্ঞ মহাত্মাগণ কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিলে, অথবা হিন্দু বালকগণের মন হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলে, সফলমনোরথ হইব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা বাগচী

বলিহার রাজধানী ছোট তরফ।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—কাশীধাম	...	...	১
পঞ্চতীর্থের বিবরণ ...	...	...	৫
চক্র পুষ্করিণী বা মণিকর্ণিকার বিবরণ ...		...	৫
দশাশ্বমেধ ঘাটের বিবরণ ও মাহাত্ম্য ...		...	৭
পঞ্চনদ বা পঞ্চগঙ্গা তীর্থের বিবরণ ...		...	৯
কাশীক্ষেত্রের শিবলিঙ্গের বিবরণ	...	...	১৮
প্রণবেশ্বর উপাখ্যান ...	...	...	১৩
ত্রিলোচন আবির্ভাব ...	...	...	১৪
কেদারেশ্বরের আবির্ভাব	...	...	ঐ
ধর্ম্মেশ্বরের মাহাত্ম্য ...	...	...	১৫
বীরেশ্বরের আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য	...	...	১৬
কামেশ্বর লিঙ্গের বিবরণ ...	...	...	১৭
বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের আবির্ভাব	...	...	ঐ
রত্নেশ্বরের আবির্ভাব ...	...	...	১৯
কৃত্তিবাসাবির্ভাব ...	...	...	২০
অবিমুক্তেশ্বরের আবির্ভাব	...	...	২১
চন্দ্রেশ্বরের বিবরণ ...	...	...	২৩
কালভৈরবের আবির্ভাব ...	...	...	২৪
দণ্ডপাণির আবির্ভাব ...	...	...	২৭
জ্ঞানবাপীর উৎপত্তি বিবরণ	...	...	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাশীক্ষেত্রে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব	৩০
অন্য স্থানের ও কাশীক্ষেত্রের উত্তরবাহিনী গঙ্গার মহিমা	৩১
কাশীক্ষেত্র যে পৃথিবী হইতে পৃথক্ অর্থাৎ মহাদেবের ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত তাহার দৃষ্টান্ত। (প্রত্যক্ষ ও পৌরাণিক)	৩২
মৃত্যু লক্ষণ	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়—৺ গয়াধাম	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়—বৈদ্যনাথ ধাম	[illegible]
ধর্ণা বা হত্যা দেওয়ার বিবরণ	৪৬
চতুর্থ অধ্যায়—তীর্থরাজ প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং নৈমিষারণ্যের বিবরণ	৫১
অযোধ্যা বা রামগয়াতীর্থ	৫৪
নৈমিষারণ্য	৫৫
পঞ্চম অধ্যায়—মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন এবং পুষ্কর তীর্থ।	৫৭
মথুরা —	ঐ
শ্রীবৃন্দাবন ধাম	৫৮
পুষ্কর তীর্থ	৬২
ষষ্ঠ অধ্যায়—হরিদ্বার, কনখল, চণ্ডীর পাহাড় এবং বদরিকাশ্রম	ঐ
চণ্ডীর পাহাড়	৬৪
কনখল তীর্থ	৬৫
বদরিকাশ্রম	৬৬
সপ্তম অধ্যায়—জগন্নাথ, চন্দ্রনাথ এবং কামাখ্যা ...	৬৮
চন্দ্রনাথ বা বাড়বাকুণ্ড	৭০
কামাখ্যা তীর্থ	৭১
পরিশিষ্ট—স্বর্গাদি নির্ণয়	৩৭

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায় প্রাণে ন সম্বন্ধ কা কস্য পরিবেদনা ॥

তীর্থ-মুকুর

প্রথম অধ্যায়।

কাশীধাম।

কলুষনাশিনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়নিবাস কাশীপুরী বিরাজমানা আছে। কাশী, বারানসী, রুদ্রাবাস, আনন্দ কানন, অবিমুক্ত ক্ষেত্র, মহাশ্মশান, কাশীক্ষেত্রের নাম। ইহার উত্তর সীমা বরণা নদী। দক্ষিণ সীমা অসী নদী। পূর্ব্ব সীমা পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী। * পশ্চিম সীমা দেহলী গণেশের মন্দির। কাশীক্ষেত্রের পরিমাণ পাঁচ ক্রোশ। এই নগরটি গঙ্গাঘাট রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দৃষ্টি করিলে, ধনুকের ন্যায় দেখা যায়। কাশীধামের ন্যায় সুদৃশ্য রমণীয় তীর্থস্থান কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। এই নগরে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত মনোহর অট্টা-

---

* কাশীখণ্ডের মর্ম্মানুসারে, কাশীর পূর্ব্ব দিকের গঙ্গার জলও কাশী-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বোধ হয়। সুতরাং তাহাতে কাশীক্ষেত্রের পূর্ব্ব সীমা ঐ গঙ্গার পূর্ব্ব পার বা ব্যাসকাশী লিখা উচিত ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকে যে স্থানকে কাশীক্ষেত্র বলিয়া থাকে, তাহার পূর্ব্ব সীমা গঙ্গাই বলা যায়। এ প্রযুক্ত পূর্ব্ব সীমা গঙ্গাই লিখিত হইয়াছে।

লিকা শ্রেণী দ্বিতল, ত্রিতল, চতুস্তল প্রভৃতি, বহুবিধ রাগে রঞ্জিত ও পরিশোভিত আছে। যেরূপ মরুভূমিতে বীজবপন করিলে, বৃক্ষাদি অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ জীবগণের কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে, তাহাদের কর্ম্মফল সকল নষ্ট হইয়া যায়। আর তাহাদের পাপের ফল, বা পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না; অর্থাৎ ঐ জীবগণ "নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।" সুতরাং তাহাদের আর গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ কিম্বা বারম্বার পৃথিবীতে জন্ম মৃত্যুজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ঐ জীবগণের মৃত্যুকালে দক্ষিণ কর্ণে তারক মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুগণও কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু সময়ে কাশীনাথের আজ্ঞানুসারেই যেন, দক্ষিণ কর্ণ ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া "মুক্তিলাভ" করিয়া থাকে। কাল ভৈরব ও দণ্ডপাণি এবং ঢুণ্টিরাজ গণাধিপতি কাশী-ক্ষেত্রের শাসনকর্ত্তা। তন্মধ্যে কাল ভৈরবই কাশীর রাজা বলিয়া কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে। কাশীধামের সকল স্থানেই অসংখ্য শিব-লিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশটি সর্ব্ব প্রধান মুক্তি লিঙ্গ।

কাশীধামের পাণ্ডাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণীর নাম যাত্রা-ওয়ালা, অপর শ্রেণীর নাম গঙ্গাপুত্র বা ঘাটিয়াল। যাত্রাওয়ালা-গণ যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া সমুদায় শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজা করাইয়া থাকে। গঙ্গাপুত্রগণ মণিকর্ণিকা প্রভৃতি ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া তীর্থস্নানের সময় সঙ্কল্প মন্ত্রাদি বলিয়া দেয়। পরন্তু যাত্রি-গণের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যজাত স্নানের সময় গঙ্গাপুত্র বা ঘাটিয়ালগণ নিজ তত্ত্বাধীনে রাখিয়া থাকে, নতুবা অপহৃত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যাত্রাওয়ালা ও গঙ্গাপুত্র প্রত্যেক যাত্রীর নিকট ১/০ এক টাকা এক আনা পাইয়া থাকে। যাত্রীর অবস্থা ভাল হইলে,

ঐ নিয়মমত কার্য্য হয় না, অর্থাৎ ঐরূপস্থলে অধিকও লইয়া থাকে। কাশীবাসীগণের বাড়ী, যাত্রাওয়ালা ও গঙ্গাপুত্রগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। সুতরাং যে বাড়ীতে যাত্রিগণ গেলে, যে যাত্রিওয়ালার বা গঙ্গাপুত্রের অধিকৃত হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। কাশীধামে নূতন কতকগুলি লোক যাত্রাওয়ালার ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহাদের অধিকারে অর্থাৎ বাড়ীতে যে যাত্রিগণ যায়, তাহারা স্বাধীনভাবে কাশীধামের কোন কার্য্যই করিতে পারে না, তাহাদের সকল কার্য্যই ঐ যাত্রাওয়ালাদের ইচ্ছামত করিতে হয়। মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি ঘাটে স্নানাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি মুক্তি-লিঙ্গের ও কালভৈরব প্রভৃতি কাশীরক্ষকের দর্শন ও পূজা এবং সাধ্যমত দানাদি এবং ব্রাহ্মণকুমারী ও ব্রাহ্মণপত্নীকে যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্কার দিয়া পূজা ও ভোজন করান এবং ব্রাহ্মণভোজন ও ঐ ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান, ও গৈরিক বসন যুগল প্রদানকরত সম্ভবমত দণ্ডী ও ব্রহ্মচারী ভোজন করান, কাশীধামের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কাশীধামের তুল্য মুক্তিক্ষেত্র কুত্রাপি নাই। এস্থানে দেহত্যাগ করিলে জীবের বিনাতপস্যায়ই মুক্তিলাভ হয়। যাত্রিগণ মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নান করত পিতৃলোকের পিণ্ডদানাদি পূর্ব্বক, মণিকর্ণিকেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করণানন্তর ঢুণ্ঢিরাজ গণেশের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকে। অতঃপর জ্ঞানবাপীতে কৃতস্নান হইয়া অথবা ঐ জল মস্তকে ধারণকরত মহালিঙ্গ বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও সাধ্যমত পূজা করা সাধারণ নিয়ম। তৎপর জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবীর দর্শন ও শক্তি অনুসারে পূজা করণানন্তর, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে * বিরা-

* এই মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে।

ষ্ঠিত দণ্ডপাণি * প্রভৃতি শিবলিঙ্গের পূজাদি সম্পন্নকরত, ত্রয়োদশটি মুক্তিপ্রদ শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজা করা কর্ত্তব্য। অতঃপর মঙ্গলবার বা চতুর্দ্দশী তিথিতে কাশীরাজ কালভৈরবের দর্শন ও পূজা করিতে হয়। যে সকল যাত্রী অল্পকালমাত্র কাশীধামে থাকে, যাহাদের মঙ্গলবারাদি পাইবার আশা নাই, তাহারা বিশ্বেশ্বর প্রভৃতির পূজাদি করিয়াই কাল ভৈরবের পূজা করিয়া থাকে।

পঞ্চতীর্থের বিবরণ।

নৌকারূঢ় হইয়া, প্রথমতঃ অসীঘাটে স্নান করত তর্পণাদি করণানন্তর, তথায় একটি মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া, অসী সঙ্গমেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা পূর্ব্বক, দশাশ্বমেধ ঘাটে পুনঃস্নান ও তর্পণাদি উক্ত প্রকার কার্য্য করিয়া, দশাশ্বমেধেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজাকরত, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বরণাঘাটে স্নানাদি করিয়া, আদি কেশবাদি বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজাদি করণানন্তর, পঞ্চগঙ্গার ঘাটে পূর্ব্ববৎ স্নানাদি করত বিষ্ণুমূর্ত্তি বিন্দুমাধব দেবের পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া, মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নানাদি করত মহালিঙ্গ বিশ্বেশ্বরের পূজাদি করার নাম পঞ্চতীর্থ করা বলে। প্রত্যেক ঘাটের স্নানের ফল, ঐ সকল ঘাটের মাহাত্ম্য বর্ণনের সময় বর্ণিত হইবে। কাশীক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে

---

* সাধারণ রীতি এই রূপ থাকিলেও, কাশীখণ্ডের মর্ম্মানুসারে বিশ্বেশ্বরের পূজা করার পূর্ব্বেই ঢুণ্ডিরাজ গণেশের ও দণ্ডপাণির পূজা করা কর্ত্তব্য।

উত্তরবাহিনী প্রবলতরঙ্গময়ী মাতা জাহ্নবী যেন ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের ভয়েই স্বীয় তরঙ্গ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্থিরভাবে আছেন ; অর্থাৎ কখনও কাশীক্ষেত্রের মৃত্তিকা গঙ্গাতরঙ্গে ভঙ্গ হইতে দেখা যায় না। এই-জন্যই হিন্দু স্বাধীন রাজাগণ গঙ্গার গর্ভ হইতে প্রস্তরময়ী অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঐ সকল রমণীয় সুরঞ্জিত অট্টালিকার শোভা সন্দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়। এস্থানে সর্ব্ব প্রকার ফল, মূল, শাক, তরকারী, মিষ্টান্ন ও সুখাদ্য দ্রব্য যেরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানেই সেরূপ পাওয়া যায় না।

চক্র পুষ্করিণী বা মণিকর্ণিকার বিবরণ।

মহাপ্রলয়ের পর জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম স্বেচ্ছামত আদিদেব (মহা-দেবমূর্ত্তি) পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ আদিপুরুষ মহাদেব বিহার করিবার জন্য, নিজ শরীর হইতে আদ্যাশক্তি মহামায়ার সৃষ্টি করার পর, ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের পদতল হইতে পঞ্চক্রোশ পরিমাণ কাশী-ক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়। প্রলয়কালেও ঐ মহাদেব ও মহামায়া কাশী-ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করেন নাই, এজন্য ইহার নাম "অবিমুক্ত" হই-য়াছে। এই ক্ষেত্র তাঁহাদের আনন্দরাশি বলিয়াই ইহার নাম, "আনন্দ কানন" হইয়াছে। অনন্তর ভগবান্ মহেশ্বর ও ভগবতী মহামায়ার এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, অপর একজন পুরুষ সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সেই পুরুষের প্রতি সমস্ত সংসারের ভার অর্পণকরতঃ তাঁহারা

সচ্ছন্দে আনন্দ কাননে বিহার করিতে পারিবেন। এবং কাশী-ক্ষেত্রে পরিত্যক্তপ্রাণ জীবগণের নির্ব্বাণ পদ প্রদান করিবেন। আর ইহাও তাঁহাদের মনে হইল যে, ঐ প্রধান পুরুষ সৃজন ও পালন সক্ষম হয়েন, তাহাও কর্ত্তব্য। জগজ্জননী সর্ব্বচৈতন্যরূপিনী মহা-মায়ার সহিত জগৎপিতামহেশ্বর ধূর্জ্জটি এই পরামর্শ স্থির করিয়া স্বীয় বাম অঙ্গে সুধামোচনকারিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ অঙ্গ হইতে ত্রৈলোক্যসুন্দর চতুর্ভুজ পীতবসন, নীলমণি সদৃশ নীলবর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী, মহাবিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। ঐ মহাবিষ্ণুর নাভি হ্রদে, পরম সুগন্ধময় পদ্ম বিকসিত হইল। সেই পুরুষ সকল পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ নিবন্ধন, তাঁহার পুরুষোত্তম নাম হইল। তখন আদিদেব মহেশ্বর বিষ্ণুকে বলিলেন, "হে মহাবিষ্ণো! বেদ চতুষ্টয় তোমার নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত হইবে, সেই সকল বেদ হইতে তুমি সকল বিষয় জানিতে পারিবে। হে অচ্যুত! বেদপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনকরত তুমি যথোচিত বিধান করিও।" তদনন্তর মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মহাবিষ্ণু স্বীয় চক্রের দ্বারা একটি পুষ্করিণী খননকরত, স্বকীয় ঘর্ম্মাম্বু দ্বারা ঐ পুষ্করিণী পরিপূর্ণ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন থাকিয়া মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভগবান্ ভবানীপতি, মহামায়া জগদম্বার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া, সহর্ষে স্বীয় মস্তক আন্দোলনকরত মহাবিষ্ণুকে তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেবের কর্ণ হইতে মণিময় কর্ণিকা ঐ স্থানে পতিত হওয়ায়, তদবধি ঐ স্থানের নাম মণিকর্ণিকা হই-য়াছে। অতএব চক্রতীর্থ ও মণিকর্ণিকা এক স্থানপ্রযুক্ত এক তীর্থই বলা যায়। তাহার পর মহাদেব মহাবিষ্ণুকে বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা

করিলে, ভগবান্ পীতবসন শ্রীবিষ্ণু কহিলেন, "সর্ব্বদাই যেন জগন্মাতা ভবানীর সহিত আপনকার দর্শন পাই এবং জীবগণ কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলে যেন, তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে ও এই স্থানে দান, যজ্ঞ, শিবলিঙ্গ স্থাপনাদি যে কিছু সৎকার্য্য মনুষ্যাদি জীবগণ করিবেক, তাহার ফলে যেন তাহাদের পুনরাবৃত্তিরহিত মোক্ষপদবী লাভ হয়।" ভগবান্ ভবানীপতি মহাদেব প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "হে মহাবিষ্ণো! তোমার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হউক।" তদবধি ঐ স্থানে ও পঞ্চক্রোশ পরিমিত কাশীক্ষেত্রে জীবগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, মহাদেবের প্রসাদে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। যোগীগণ বনবাসী ও পর্ণফলাশী হইয়া যাবজ্জীবন তপস্যাকরত যে ফললাভ করিতে পারে, কেবলমাত্র কাশীধামে প্রাণত্যাগেই জীবগণের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (মোক্ষফল) লাভ হইয়া থাকে। মণিকর্ণিকা উৎপত্তি হওয়ার বহুকাল পরে সূর্য্যবংশাবতংশ ভগীরথ ঐ মণিকর্ণিকার সহিত ভাগীরথীকে সম্মিলিত করায়, ঐ স্থান অধিকতম শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের বিবরণ ও মাহাত্ম্য।*

প্রজাপতি চতুরানন ব্রহ্মা, মহাদেব কর্ত্তৃক কাশীতে প্রেরিত হইয়া, দিবোদাস নৃপতির কাশীরাজ্যচ্যুত করার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোন উপায়েই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে না পারিয়া, একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণকরত দিবোদাস রাজর্ষিকে

---

* দশাশ্বমেধ ঘাটের কিয়দ্দূর উত্তরে রাজা মানসিংহের নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ মান মন্দির দর্শন করিলে, হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণকে কেহই ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং ঐ মন্দিরে যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আশীর্বাদ করণানন্তর উপবেশন করিয়া তাঁহার নানাবিধ প্রশংসা-পূর্ব্বক পরিশেষে তাঁহার নিকট, দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত প্রার্থনা করিলেন। দিবোদাস নৃপতিও তৎক্ষণাৎ স্বীকার করত যজ্ঞের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল, রুদ্র সরোবরে (বর্ত্তমান দশাশ্বমেধঘাটে) প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ বেশধারী ব্রহ্মা ঐ স্থানে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞ করায়, তাহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। ঐ স্থানে স্নান, দান, যজ্ঞ ইত্যাদি যে কিছু সৎকার্য্য করা যায়, তাহার ফল অক্ষয় হয়। দশাশ্বমেধঘাটে স্নানকরত দশাশ্বমেধেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ সমুদায় পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। দশহরা (দশমী) তিথিতে দশাশ্বমেধঘাটে স্নান করিলে, মানবগণকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। দশাশ্বমেধেশ্বর শিবলিঙ্গ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে মানবগণ দশজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।

পঞ্চনদ বা পঞ্চগঙ্গা তীর্থের বিবরণ।

মহাতীর্থ মুক্তিপ্রদ কাশীক্ষেত্রে ভৃগুবংশাবতংশ মহাতপা বেদশিরা নামক এক ঋষি বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিতেছিলেন। এক দিন ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে শুচি নাম্নী অনুপমাসুন্দরী অপ্সরা উপস্থিত হইলে, মহর্ষি বেদশিরা ঐ ত্রিলোকবিখ্যাতা রমণীয়া অপ্সরা শুচির রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া অসহ্য কামবেগ ধারণ করিতে না পারাতে তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইল। অপ্সরা শুচি ঐ ঘটনা দেখিতে পাইয়া, ব্রহ্মশাপ ভয়ে অত্যন্ত ভীতা হইয়া, মহর্ষি বেদশিরাকে নানাবিধ স্তব

করত স্বীয় নির্দ্দোষীতা জানাইলেন। মহর্ষি বেদশিরা শুচির কোন দোষ না থাকা প্রযুক্ত, তাঁহাকে অভয় বাক্য দ্বারা আশ্বস্ত করত বলিলেন, "সুন্দরি! ঋষিদিগের বীর্য্য অমোঘ, অতএব ঐ বীর্য্য তুমি গ্রহণ করত স্বীয় উদরে স্থাপন কর, ইহাতে যথাকালে তোমার গর্ভ হইতে পরমাসুন্দরী একটি কন্যারত্ন প্রসূতা হইবে।" ত্রাসিতা শুচি শাপভয় কথঞ্চিৎ নিবারণ হওয়ায় তপোনিধি বেদশিরার আজ্ঞামত কার্য্য করিয়া তথায়ই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে যথাকালে শুচির গর্ভ হইতে পরমাসুন্দরী একটি কন্যারত্ন প্রসব হওয়ায়, ঐ কন্যাটি তপোধন বেদশিরার আশ্রমে রাখিয়া, অপ্সরা শুচি অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি বেদশিরা হরিণীর স্তন্য-দুগ্ধের দ্বারা ঐ মৃগনয়না কন্যাটি প্রতিপালনকরত যথাকালে তাহার নাম ধূতপাপা রাখিলেন। মুনিকন্যা ধূতপাপা মহামুনি বেদশিরার যত্নে প্রতিপালিতা হইয়া অষ্টম বর্ষ বয়স্কা হইলে, উপযুক্ত বরে কন্যা সমর্পণ করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়া, একদিন তপোনিধি বেদশিরা স্বীয় কন্যা ধূতপাপকে বলিলেন, "বৎসে! কোন্ বরে তোমাকে সম্প্রদান করিব, তাহা তুমি ব্যক্ত করিলে অভিলষিত বরের অন্বেষণ করিতে পারি।" তথন ধূতপাপা কিঞ্চিৎ লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিলেন, "পিতঃ! ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজই আমার মনোনীত বর, আমি অন্য বর ইচ্ছা করি না।" মহামুনি বেদশিরা স্বীয় কন্যার অভিলষিত বর জানিতে পারিয়া বলিলেন, বৎসে! বিনা তপস্যায় ঐ বর লাভ অসম্ভব। অতঃপর ধূতপাপা স্বীয় পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধানে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিলে, ভগবান্ চতুরানন প্রত্যক্ষভাবে মুনিকন্যা ধূতপাপার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তুমি অভিলষিত

বর প্রার্থনা কর।” তখন তপঃকৃশা ধূতপাপা আনন্দিতা হইয়া, ব্রহ্মার নিকট বলিলেন, “পিতামহ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজকে আমি পতিরূপে লাভ করিতে পারি এই আমার প্রার্থনা।” প্রজাপতি ব্রহ্মা ধূতপাপাকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন “ধর্ম্মরাজই তোমার পতি হইবেন তাহাতে তুমি কিছু মাত্র সন্দেহ করিও না।” এই কথা বলিয়া কমলসম্ভব ব্রহ্মা অন্তর্দ্ধান হইলে ধূতপাপা সমুদায় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত স্বীয় পিতা বেদশিরা ঋষির নিকট জানাইলেন। মহর্ষি বেদশিরাও কন্যা ধূতপাপাকে বলিলেন, “বৎসে! ব্রহ্মার বর কখনও অন্যথা হইবে না। এক্ষণে তুমি আমার আশ্রমেই অবস্থান কর। কতকদিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন স্ত্রীকুসুমপ্রস্ফুটিতা ত্রিলোকসুন্দরী অনুপমা ধূতপাপা নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্টা আছেন, তথায় ব্রাহ্মণ রূপধারী ধর্ম্মরাজ কাম মোহিত হইয়া ধূতপাপাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহে বিবাহিত হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে বলিলেন। ধূতপাপা বলিলেন, “কন্যাদানকর্ত্তা পিতা বেদশিরা মহর্ষির নিকট আপনার অভিলষিত বিষয় ব্যক্ত করুণ, আমার নিকট ঐ বিষয়ে আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় করিবেন না।” ব্রাহ্মণ বেশধারী ধর্ম্মরাজ ঐ কথায় কর্ণপাত না করায়, ধূতপাপা তপঃপ্রভাবে অধিকতর ক্রোধান্বিতা হইয়া ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, “হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি এক্ষণেই নদরূপে পরিণত হও।” ধর্ম্মরাজও ঐ সময় মহাক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, “অয়ি দুর্ম্মতে কঠিনহৃদয়ে! তুমি এই স্থানে শিলারূপে পরিণতা হও।” তখন ধূতপাপা ব্রাহ্মণ-রূপী ধর্ম্মের অভিসম্পাতে ত্রাসিতা হইয়া পিতা বেদশিরা ঋষির নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বেদশিরা কিঞ্চিৎ কাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া জানিতে পারিলেন, ধর্ম্মরাজই ব্রাহ্মণরূপ

ধারণকরত ধূতপাপার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ যোগীশ্রেষ্ঠ বেদশিরা স্বীয় দুহিতা ধূতপাপাকে বলিলেন, "বৎসে! তোমার চির অভিলষিত ভর্ত্তা ধর্ম্মরাজকে চিনিতে না পারিয়া শাপ প্রদান করিয়াছ। অতএব, তোমরা উভয়েই আমার তপঃপ্রভাবে নদ ও নদীরূপে এবং কখনও স্বাকারে এই স্থানে মিলিত হইতে পারিবে।" তখন মহর্ষি বেদশিরার বরে ধূতপাপা চন্দ্রকান্ত শিলারূপে পরিণতা হইয়া চন্দ্রের কিরণ সংস্পর্শে বিগলিতা হইয়া, নদীরূপে পরিণতা হইলেন। ধর্ম্মরাজও ধূতপাপার শাপে ঐ স্থানে ধর্ম্মনদ নামে বিখ্যাত হইলেন। অতঃপর ঐ স্থানে তপঃক্লিষ্ট সূর্য্যদেবের ঘর্ম্মসম্ভূত কিরণা নদী উৎপত্তি হইয়া, তথায় মিলিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর তীর্থময়ী গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনা পূর্ব্বোক্ত স্থানে মিলিতা হওয়ায় ঐ স্থানের নাম মহাতীর্থ পঞ্চনদ বা পঞ্চগঙ্গা হইয়াছে। অতঃপর মহাদেবের আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠপতি পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু, দিবোদাস নৃপতিকে নানা মায়ায় কাশীরাজ্যচ্যুত করত পঞ্চনদ হ্রদের নিকটে শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে যোগীশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবচূড়ামণি অগ্নিবিন্দু, ভগবান্ নারায়ণকে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। অগ্নিবিন্দুর স্তবে ভগবান্ অচ্যুত প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন মহাযোগী অগ্নিবিন্দু বলিলেন, "আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে জীবগণের মুক্তি জন্ত আপনি এই পঞ্চনদতীর্থে সর্ব্বদাই অবস্থান করুন।" তখন ভগবান্ পীতাম্বর বনমালী পুণ্ডরীকাক্ষ বলিলেন, "আমি এই পঞ্চনদতীর্থে সর্ব্বদা অবস্থান করিব এবং ঐ তীর্থের আর একটি নাম বিন্দুতীর্থ হইবে। তোমার নামের অর্দ্ধভাগ লইয়া আমি বিন্দুমাধব নামে খ্যাত হইয়া এই স্থানে ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করিব।"

অতএব এই পঞ্চনদতীর্থে দান, যজ্ঞ পূজাদি যে কোন সৎকার্য্য করা যায়, তাহার ফলে ঐ সৎকার্য্যকারীর পিতৃলোক সহ স্বর্গবাস হয়। কার্ত্তিক মাসে প্রত্যূষে তিন দিন কেহ পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া ৺বিন্দুমাধব দেবকে দর্শন ও পূজা করিলে, তাহার সর্ব্বপাপ বিনাশ হয় এবং তাহাকে আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না। এই পঞ্চনদ তীর্থের অসীম মহিমা কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে। বেণীমাধবের মন্দিরের নিকটে দুইটি বৃহৎ অত্যুচ্চ মানমন্দির বা মনুমেণ্ট আছে। কাশীধামে ইদানীং বিন্দুমাধব দেবকে সকলেই বেণীমাধব বলিয়া থাকে।

কাশীক্ষেত্রের শিবলিঙ্গের বিবরণ।

এই আনন্দকাননে দেবগণ, ঋষিগণ ও যক্ষ, রক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, মানব, অপ্সরা, কিন্নর প্রভৃতি সকলেই আপন আপন নামানুসারে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, এবং কতকগুলি শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভূ। ঐ সকল শিবলিঙ্গ মধ্যে, কতকগুলি নানাবিধ ধাতুময়, কতকগুলি রত্নময়, এবং অধিকাংশই প্রস্তরময়। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, কোন সময়ে জগৎ পিতা ত্রিলোচন বিশ্বেশ্বর ঐ সকল শিবলিঙ্গ গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহাতে পরার্দ্ধশত সংখ্যা কাশীক্ষেত্রের স্থলভাগে এবং ষষ্টি কোটি গঙ্গাজল মধ্যে গণিত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আর যে কত শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই, সুতরাং কাশীক্ষেত্রের শিবলিঙ্গ অসংখ্য বলিলেই যথেষ্ট হয়। ঐ সমুদায় শিবলিঙ্গ মধ্যে চতুর্দ্দশটি সর্ব্ব প্রধান মুক্তিপ্রদ শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহাদের নাম যথা, প্রথম প্রণবেশ্বর,

দ্বিতীয় ত্রিলোচন, তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ কৃত্তিবাস, পঞ্চম রত্নেশ্বর, ষষ্ঠ চন্দ্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অষ্টম ধর্ম্মেশ্বর, নবম বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, দ্বাদশ মণিকর্ণিকেশ্বর, ত্রয়োদশ অবিমুক্তেশ্বর, এবং চতুর্দ্দশ মহালিঙ্গ বিশ্বেশ্বর। কাশীক্ষেত্রস্থ সমুদায় শিবলিঙ্গেরই পূজা করা উচিত, কিন্তু অসংখ্য শিবলিঙ্গের পূজা করা কোন মনুষ্যেরই সাধ্য নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটি মহালিঙ্গের পূজা করা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রণবেশ্বর উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি চতুরানন ব্রহ্মা সমাধিস্থ হইয়া সহস্র যুগ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ সময় সপ্তপাতাল ভেদকরত দিক্ সমূহকে আলোকিত করিয়া মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রণবেশ্বর লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মার নানাবিধ স্তবে প্রসন্ন হইয়া, ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ঐ লিঙ্গ হইতে শঙ্কর মূর্ত্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া, ব্রহ্মাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন ব্রহ্মা আনন্দাশ্রু নয়নে গদগদ স্বরে বলিলেন "প্রভো! এই লিঙ্গে আপনি সর্ব্বদা অবস্থান করুন।" মহাদেব তাহাই স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার নাম সকলেই পিতামহ বলিবে, এবং তুমি সর্ব্ব প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হও। এই লিঙ্গ প্রণবেশ্বর নামে জগতে খ্যাত হইবে। এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।" মৎস্যোদরীতীরে এই মহালিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিলে, মানবের যে কোন স্থানে মৃত্যু হউক না কেন, তাহার নিশ্চয়ই স্বর্গবাস হয়। কপিল প্রভৃতি মহামুনিগণ ঐ লিঙ্গের আরাধনা-

করত নৃত্য করিতে করিতে ঐ লিঙ্গ মধ্যে বিলীন হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ত্রিলোচন আবির্ভাব।

পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব যখন সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, সেই সময় পাতাল ভেদ করত ত্রিলোচন লিঙ্গ স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভগবান্ ধূর্জ্জটি ঐ মহালিঙ্গ মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া জগন্মাতা ভগবতীর তৃতীয় নেত্রটি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ঐ মহালিঙ্গের নাম ত্রিলোচন হইয়াছে। মানবগণ পিলিপিলা তীর্থে স্নানান্তে ঐ মহালিঙ্গের দর্শন ও পূজা করিলে সকল পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থানে পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোকেরাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিলোচনের পূজা করে, তাহারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করে এবং তাহারা মহাদেবের নিত্য-সহচর হয়।

কেদারেশ্বরের আবির্ভাব।

পূর্ব্বকাল হইতে হিমালয় পর্ব্বতে কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। শৈবশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঋষি প্রতিবর্ষেই চৈত্রমাসে কেদারেশ্বরের দর্শন জন্য হিমাচলে যাইতেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ জরাগ্রস্ত হইয়াও হিমালয়ে যাত্রাকরা দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তখন ভগবান্ আশুতোষ বশিষ্ঠ ঋষির অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বপ্নে বলিলেন, "হে দৃঢ়ব্রত! আমি কাশীক্ষেত্রেই কেদারেশ্বর লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলাম, আর তোমাকে হিমালয় পর্ব্বতে যাইতে হইবে না।" তদবধি হিমাচলের কেদারো

শিবলিঙ্গের নিকট যে তীর্থ বিদ্যমান আছে, কাশীক্ষেত্রেও কেদারেশ্বরের নিকট সেই সকল তীর্থ উৎপত্তি হইল। অর্থাৎ হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ, মধুস্রবা গঙ্গা আছেন, কাশীক্ষেত্রে কেদারেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, হরপাপহ্রদ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ভক্তগণের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হরণ করিতেছেন। পুরাকালে জগন্মাতা ভগবতী হরপাপহ্রদে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার গৌরীকুণ্ড নাম হইয়াছে এবং তাহার মানসতীর্থও একটি নাম আছে। পূর্ব্বকালে কোন ব্যক্তি ঐ গৌরীকুণ্ডে স্নান করিলেই মুক্তিলাভ করিত। অনন্তর মনুষ্যের মুক্তি দর্শনে অসহ্য হইয়া, দেবগণ আসিয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ ভবানীপতির নিকট বলিলেন, "কাশীক্ষেত্রের কেদার কুণ্ডে স্নান করিলেই যদি মনুষ্য মুক্তি লাভ করে, তবে পৃথিবীতে কেহ আর ধার্ম্মিক থাকিবে না। অতএব যে ব্যক্তি ঐ স্থানে দেহত্যাগ করিবেক, তাহাকেই আপনি মুক্তি প্রদান করুন।" দেবগণের বাক্যে মহাদেব ত্রিপুরারি তাহাই স্বীকার করিলেন। তদবধি পশুপতি বৃষধ্বজ এই আজ্ঞা করিলেন যে, যে ব্যক্তি কেদারকুণ্ডে স্নানকরত ভক্তিভাবে কেদারেশ্বরের পূজা ও আমার নাম জপ করিবে, তাহাদিগের অন্য স্থানে মৃত্যু হইলেও আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব। যে ব্যক্তি কেদারতীর্থে স্নানকরত পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিবে, তাহার একোত্তর শত পুরুষ স্বর্গবাসী হইবে।

ধর্ম্মেশ্বরের মাহাত্ম্য।

সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ ষোড়শ যুগ পর্য্যন্ত স্বনামখ্যাত ধর্ম্মেশ্বর মহালিঙ্গের আরাধনা করায়, ভগবান্ ত্রিনয়ন আশুতোষ প্রসন্নচিত্তে

তথায় উপস্থিত হইয়া, যমরাজকে পাপপরায়ণ সমস্ত জীবগণের অন্তিমে দণ্ডবিধানের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের দর্শনমাত্রই মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র কোন সময় ধর্ম্মকূপতীর্থে স্নান ও ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের দর্শন ও পূজা করিয়াই বৃত্র বিনাশ জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে ঐ মহালিঙ্গের সন্নিধানে একটি বটবৃক্ষ থাকাপ্রযুক্ত ঐ বৃক্ষ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত করিয়াছিল। ঐ স্বর্ণময় বটবৃক্ষারূঢ় শুকপক্ষী-শাবকগণ ধর্ম্মরাজের প্রার্থনানুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের বরে মুক্তিলাভকরত শিবলোকে গমন করিয়াছিল। অতএব, কাশীক্ষেত্রস্থ ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের পাপনাশন মাহাত্ম্য অসীম। গঙ্গাদ্বারে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এবং বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে, নর্ম্মদায়, সরস্বতীতে, গোমতীতে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানব ধর্ম্মকূপে স্নান করিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারে।

বীরেশ্বরের আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুভক্ত অমিত্রজিৎ নৃপতির, বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, জাতমাত্র পরিত্যক্ত শিবভক্তিপরায়ণ সন্তানের অলৌকিক পুণ্য ও তপোবলে তাঁহার তপঃক্ষেত্রে সপ্তপাতাল ভেদকরত বীরেশ্বর মহালিঙ্গ আবির্ভূত হন। ঐ বলে তপস্বীর প্রার্থনানুসারে ভগবান্ চন্দ্রশেখর ঐ লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থিতি করা স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ শিবলিঙ্গের বিনা মন্ত্রে, ভক্তিসহকারে পূজা করিলেই মানব অক্ষয় পুণ্য লাভ ও কামনাসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

কামেশ্বর লিঙ্গের বিবরণ।

তপস্বীশ্রেষ্ঠ মহাক্রোধপরায়ণ. দুর্ব্বাসা ঋষি, নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে কাশীক্ষেত্র তাঁহার নিতান্ত প্রীতিকর বোধ হওয়ায় তথায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহুকাল গত হইলেও ইষ্টদেব ভগবান্ চন্দ্রশেখর দর্শন না দেওয়ায়, দুর্ব্বাসা ঋষি মহাক্রোধে প্রজ্বলিতাগ্নিসন্নিভ হইয়া, কাশীক্ষেত্রকে ধিক্কার দিয়া এবং কাশীস্থ তপস্বীগণকে নিন্দা করত, মোক্ষধাম কাশীক্ষেত্রে আর কেহ প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ না করে, এইরূপ শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। তখন আশুতোষ মৃত্যুঞ্জয় হাস্য করিবামাত্র, তথায় প্রহসিতেশ্বর নামক একটি শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। কিছু কাল পরে, দেবাধিদেব মহাদেব ঐ লিঙ্গ হইতে শঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত মহাতেজা দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিলেন, "হে তপোনিধে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থণা কর।" তখন দুর্ব্বাসা মুনি বহুবিধ স্তব করত বলিলেন, "হে সর্ব্ব-মঙ্গলময় সদাশিব, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রার্থনা এই যে এই লিঙ্গ সকলেরই কামপ্রদ হউক এবং আমার কৃত এই ক্ষুদ্র জলাশয়ও কামকুণ্ড হউক।" ভগবান্ ত্রিপুরারি বলিলেন, "তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক। এই লিঙ্গ কামেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া, জীবগণের সকল কামনারই সিদ্ধি প্রদান করিবে।"

বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের আবির্ভাব।

ত্বষ্টৃ নামা প্রজাপতির পুত্র, সর্ব্বকর্ম্মনিপুণ বিশ্বকর্ম্মা, ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মারই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। তিনি গুরুর নিকট বাস করিয়া

ভিক্ষার দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং যথাবিধি গুরুর শুশ্রূষা করিতেন। একদা বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার গুরু বলিলেন, "বর্ষাতে আমি ক্লেশ না পাই তুমি তদনুরূপ একটি পর্ণ-কুটীর প্রস্তুত কর। ঐ কুটীর যেন, কখনও ভগ্ন বা পুরাতন না হয়।" তাঁহার গুরু পত্নী বলিলেন, "বল্কলময় অতি উজ্জ্বল কঞ্চুক প্রস্তুত কর, তাহা যেন কখনই শ্লথ না হয়।" তাঁহার গুরুপুত্র বলিলেন, "আমার জন্য এক যোড়া চর্ম্মবিহীন পাদুকা প্রস্তুত কর, তাহা যেন অত্যন্ত সুখপ্রদ হয় ও তাহাতে যেন কখনই পঙ্ক স্পর্শ না করে, এবং তাহা যেন জলে স্থলে সমভাবে ব্যবহার করিতে পারি।" তাঁহার গুরু কন্যা বলিলেন, "হে ত্বাষ্ট্র! তুমি আমার জন্য দুইটি কাঞ্চনময় কর্ণভূষণ ও হস্তী-দন্ত-নির্ম্মিত কতকগুলি পুত্তলিকা এবং উদূখল ও কতকগুলি গৃহোপকরণ প্রস্তুত করিয়া দেও।" বিশ্বকর্ম্মা সকলেরই বাক্য স্বীকার করত মহাচিন্তায় অভিভূত হইয়া, বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তথায় একজন তপস্বী উপস্থিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "হে বালক! তুমি কি জন্য ভয়ানক অরণ্যে প্রবেশ করত চিন্তামগ্ন হইয়াছ?" বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, "আমি গুরু মহাশয় প্রভৃতির নিকট কতকগুলি অসাধ্য কার্য্য সাধন করার অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে ঐ কার্য্য সম্পাদন করার সম্ভাবনা না দেখিয়া, অন্তিমে নরকগামী হওয়ার ভয়ে, সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছি।" তপস্বী ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি কাশীক্ষেত্রে যাইয়া ভগবান্ চন্দ্র-শেখরের আরাধনা কর। তাহাতে তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" ঐ কথায় ত্বষ্টৃপুত্র অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়া ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই কাশীধামে গমন করত ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিতে

লাগিলেন। তিন বৎসর কাল বিশ্বকর্ম্মা শিবলিঙ্গ স্থাপন করত তপস্যা করিলে, ভগবান্ মহেশ্বর ঐ লিঙ্গ মধ্যে মূর্ত্তিমান হইয়া বলিলেন, "হে ত্বাষ্ট্র! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।" বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন, "হে দেবাদিদেব মহেশ্বর! আমি যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, ইহার উপাসনা করিয়া যেন সকলেই সদ্‌বুদ্ধি সম্পন্ন হয়।" ভগবান্ চন্দ্রচূড় বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা সিদ্ধি হইবে এবং তুমি অদ্য হইতে ত্রিভুবন মধ্যে সর্ব্ব প্রকার দ্রব্য দ্বারা যাহার যেমন ইচ্ছা তদ্রূপ অতি সুন্দর শিল্পকার্য্য করিতে পারিবা এবং তোমার নাম বিশ্বকর্ম্মা হইল। তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করিব। পরন্তু এই লিঙ্গের উপাসকগণ দেহত্যাগান্তে মুক্তিলাভ করিবেক।"

রত্নেশ্বরের আবির্ভাব।

গিরিরাজ মেনকাপতি মহা পুণ্যাত্মা হিমালয় কোন সময়ে রাজরাজেশ্বরী পার্ব্বতী জগন্মাতা উমাকে দেওয়ার জন্য নানাবিধ রত্নময় আভরণ লইয়া আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার কন্যা রাজরাজেশ্বরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত নানারত্নময় অতি রমনীয় গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার কোন দ্রব্যের অভাব নাই। তাঁহার ভাণ্ডার নানাবিধ রত্নে পরিপূর্ণ। সুতরাং গিরিরাজ, কন্যা গিরিজাকে যে সকল রত্নাভরণ দেওয়ার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা যৎসামান্য বোধ হওয়ায়, লজ্জিত হইয়া ঐ সকল রত্ন তথায় নিক্ষেপ করত মহেশ্বর কিম্বা উমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নিজালয়ে

প্রতিগমন করিলেন। হিমালয় গিরিরাজ নিক্ষিপ্ত রত্ন সমূহ হইতে রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছেন। ঐ লিঙ্গে সর্ব্বদাই মহেশ্বর চন্দ্রচূড় অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ঐ শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজা করিলে মানবগণ অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া থাকে এবং নিষ্কাম হইয়া ঐ শিবলিঙ্গের আরাধনা করিলে জীবগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

কৃত্তিবাসাবির্ভাব।

ভগবান্ মহেশ্বর কোন সময়ে রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গের বৃত্তান্ত ভবারাধ্যা ভবানী উমার নিকট বর্ণন করিতেছেন, এমন সময় তথায় দেবারি ভীষণদর্শন মহিষাসুরের পুত্র গজাসুর প্রমথগণকে মথন করিতে করিতে অতিবেগে আগমন করিল। ঐ মহাসুরের দেহ নব সহস্র যোজন পরিমিত। তাহার পদভরে পর্ব্বত সমূহ বিকম্পিত হইয়াছিল। ঐ মহাবাহু গজাসুর অন্যের অবধ্য জানিতে পারিয়া ভগবান্ ত্রিশূলী ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিশূলাগ্রে বিদ্ধ গজাসুর আপনাকে ছত্রীকৃত বিবেচনা করিয়া ত্রিলোচন শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন, "হে আশুতোষ! কালক্রমে সকলেই মরিয়া থাকে, সুতরাং আমি যে আপনার শূলাঘাতে মরিব তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু আমি যে আপনার মস্তকোপরি ছত্র স্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে আপনিও আমার নিকট পরাজিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অতএব আমি ধন্য হইলাম।" এতদ্‌শ্রবণে পরমেশ্বর মহেশ্বর বলিলেন, "হে গজাসুর আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমার নিকট

বর প্রার্থনা কর।" গজাসুর কহিলেন "হে নীলকণ্ঠ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার চর্ম্ম আপনি পরিধান করুন এবং আপনার নাম কৃত্তিবাস হউক এবং আমার এই শরীর যেন কৃত্তিবাস শিবলিঙ্গ নামে জগতে বিখ্যাত হয়।" ভগবান্ ভবানীপতি বলিলেন, "আমার বরে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, এবং কাশীক্ষেত্রে যে সকল মনুষ্য এই কৃত্তিবাস লিঙ্গের আরাধনা করিবে, তাহারা অন্তিমে অন্য স্থানে মৃত্যু হইলেও কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগের ন্যায়, মোক্ষফল লাভ করিবে।" অতএব সকল মনুষ্যেরই কাশীস্থ কৃত্তিবাসেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হংস তীর্থে স্নানান্তে সকল শিবলিঙ্গের শিরস্থানীয় কৃত্তিবাসেশ্বরের ভক্তিসহকারে পূজা করা উচিত। কৃত্তিবাস শিবলিঙ্গে সর্ব্বদা মহেশ্বর বিশ্বনাথ কলিকালেও অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ মহালিঙ্গের দর্শনেই মানবগণের জ্ঞানাজ্ঞান কৃত ও অতীত বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ পাপ বিদূরিত হয়।

অবিমুক্তেশ্বরের আবির্ভাব।

পূর্ব্বকালে দীর্ঘকালস্থায়ী অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রজাক্ষয় হওয়ায় প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া জানিতে পারিলেন, পৃথিবীস্থ রাজগণের অধর্ম্মাচরণই ঐ অনাবৃষ্টির কারণ। অতএব, তিনি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতপা রিপুঞ্জয় দিবোদাস নৃপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে মহামতে রিপুঞ্জয়! তুমি সসাগরা সদ্বীপা ধরার রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে, প্রজারক্ষার উপায় নাই।" তখন চতুরানন ব্রহ্মার আজ্ঞায় রাজর্ষি রিপুঞ্জয়, পৃথিবীতে রাজত্ব

করিতে স্বীকৃত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "আমি পৃথিবীর রাজা হইলে, দেবগণকে স্বর্গে এবং নাগগণকে পাতালে যাইতে হইবে। যদি আপনি আমার প্রার্থনা মত দেবগণকে স্বর্গে ও নাগগণকে পাতালে প্রেরণ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার পৃথিবীতে রাজত্ব করার আপত্তি নাই।" ব্রহ্মা, "তাহাই হইবে" বলিয়া দিবোদাস নৃপতির নিকট স্বীকার করিয়া, অতি সত্বর দেবাধিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য মন্দর পর্ব্বতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার প্রার্থনায় ও মন্দর পর্ব্বতের তপস্যার ফলে অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু কাশীত্যাগ করা মহাদেবের কোন প্রকারেই সম্ভাবিত না হওয়ায় এবং তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর বিধায়, স্বয়ং মহাদেব অবিমুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর নামক মহালিঙ্গ স্থাপন করত লিঙ্গরূপে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই মহালিঙ্গ স্থাপনের পূর্ব্বে কেহ কথনও কাশীক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন নাই। মহাদেবের স্থাপিত অবিমুক্তেশ্বরের আকৃতি আদি দৃষ্টে, অতঃপর ব্রহ্মাদি সকলেই শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব, এই অবিমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গই আদি ও মোক্ষফলপ্রদ। কাশীক্ষেত্রে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহাদের এই মহালিঙ্গের দর্শন ও পূজা করা কর্ত্তব্য। এই অবিমুক্তেশ্বরের দর্শন ও পূজা করিয়া, মানব স্থানান্তরে দেহত্যাগ করিলেও তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বিশ্বেশ্বরাবির্ভাব।

ভগবান্ ত্রিলোচন মহেশ্বর মন্দর পর্ব্বত হইতে কাশীক্ষেত্রে আগমন করিলে, প্রজাপতি চতুরানন ব্রহ্মা এবং গরুড়বাহন পীতবসন পুণ্ডরীকাক্ষ হরি এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সমবেত হইয়া, মহেশ্বরকে রাজাস্বরূপ ও জগন্মাতা পার্ব্বতীকে রাজরাজেশ্বরীরূপে, মুক্তিমণ্ডপে উপবেশন করাইলেন। তখন মহেশ্বরের ইচ্ছানুসারে সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া বিশ্বেশ্বর নামক মহালিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে বিশ্বমঙ্গলনিকেতন বিশ্বনাথ, দেবগণ সমক্ষে বলিলেন, আমি কখনও মূর্ত্তিমান, কখনও নিরাকার রূপে কাশীক্ষেত্রে বিরাজমান থাকিব। কিন্তু এই মহালিঙ্গে সর্ব্বদাই অবস্থান করিব। ভক্ত জীবগণ এই মহালিঙ্গের পূজা করিলে মদীয় সমুদায় লিঙ্গ পূজার ফললাভ করিবে এবং এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া অন্য স্থানে দেহত্যাগ করিলেও তাহারা সর্ব্বসুখ ভোগান্তে জন্মান্তরে মোক্ষলাভ করিবে। অতএব এই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ এবং মণিকর্ণিকার গঙ্গাজল ও কাশীক্ষেত্রের তুল্য স্থান ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই।

চন্দ্রেশ্বরের বিবরণ।

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্রের পিতা, মহাতপা অত্রি মুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত তপোনিধি মহর্ষি অত্রি তিন সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিলে তাঁহার রেতঃ সোম রূপে পরিণত ও ঊর্দ্ধগামী হইয়া দশ দিক উজ্জ্বল করিয়াছিল। তখন বিধাতার

আদেশক্রমে দশটি দেবী ঐ রেতঃ ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই গর্ভ ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া সোমের সহিত পৃথিবীতে নিপতিত হইলেন। তৎকালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সোমকে রথে আরোহণ করাইয়া একবিংশতিবার সাগরান্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সোমের যে সকল তেজঃ ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, তাহাই ওষধি রূপে পরিণত হইয়া জগৎপোষণের কারণ হইয়াছিল। অতঃপর ভগবান্ সোম ব্রহ্মার তেজে বর্দ্ধিত হইয়া কাশীক্ষেত্রে গমন করত চন্দ্রেশ্বর নামক শিব-লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বহুকাল তপস্যা দ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ভগবান্ চন্দ্রচূড় প্রসন্ন হইয়া দেবশ্রেষ্ঠ চন্দ্রকে এই রূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি এই চন্দ্রেশ্বর লিঙ্গে অবস্থান করিবেন। এই স্থানে লোকে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হইয়া থাকে। এই স্থানে অত্যল্পকাল তপস্যা করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহারা চন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন, তাঁহারা যে স্থানেই কেন মৃত্যুমুখে পতিত না হউক অন্তিমে চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটি মুক্তি লিঙ্গ মধ্যে স্কন্দ পুরাণের মর্ম্মানুসারে দ্বাদশটি মুক্তিলিঙ্গের বিবরণ মাত্র লিখিত হইল।

কালভৈরবের আবির্ভাব।

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ সুমেরু শৃঙ্গে সমবেত হইয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একমাত্র কোন্ তত্ত্ব অব্যয়?"

অর্থাৎ আপনি, বিষ্ণু এবং মহাদেব ইঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আপনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া নারায়ণের অংশে উৎপন্ন ক্রতুনামা যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অর্থাৎ বিষ্ণু হাস্য করত রোষকষায়িতলোচনে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি পরম তত্ত্ব না জানিয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছ। তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি হইয়াছে। হে বিধে! আমিই লোকসমূহের কর্ত্তা, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া জগতের জীবন ধারণ অসম্ভব। আমিই পরম জ্যোতি, আমিই পরাগতি, এবং আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তুমি প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছ।" ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপী ক্রতু বিবাদ করিয়া চারি বেদকে প্রমাণ স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বেদগণ! আপনারা সকলই জ্ঞাত আছেন। অতএব আপনারা কোন্ পদার্থ যথার্থ তত্ত্বরূপে অবগত হইয়াছেন, তাহা বলুন ?" তদুত্তরে ক্রমশঃ ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ বলিলেন, "সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মূল কারণ ত্রিগুণাত্মক কৈবল্যরূপী ভগবান্ শঙ্করকেই মহাত্মাগণ পরমতত্ত্বরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" তখন ভগবান্ শঙ্করের মায়ায় মুগ্ধ ক্রতু ও বিধি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "শ্মশানক্ষেত্রে ধূলিধূসরিত হইয়া সতত দিগম্বর রূপে শিবার সহিত ক্রীড়ারত জটাধারী বৃষবাহন অহিভূষণ সঙ্গবর্জ্জিত প্রমথনাথ কিরূপে পরম ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন ?" তখন তাঁহাদের মধ্যস্থলে স্বীয় তেজের দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবর্ত্তী স্থান উদ্ভাসিত করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ত্রিশূলহস্ত ভাললোচন সর্প ও চন্দ্র ভূষণ মহাদেব আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা মহামোহান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে চন্দ্রশেখর! তুমি আমার ভাল স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং তুমি রোদন করিয়াছিলে। এই জন্য আমি তোমার

'রুদ্র' নাম রাখিয়াছিলাম। অতএব হে পুত্র! তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" ভগবান্ মহেশ্বর ব্রহ্মার এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে কোপান্বিত হইয়া স্বীয় কোপ হইতে ভৈরবাকৃতি একটি পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে কালভৈরব! তুমি বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখের দ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন কর।" কালরাজ ভৈরব মহাদেবের আজ্ঞায় ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহা ভীত হইয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মা শঙ্করের স্তব ও শত রুদ্রী জপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবান্ আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান করত স্বীয় মূর্ত্ত্যন্তর কাল ভৈরবকে বলিলেন, "হে কালরাজ! তুমি ব্রহ্মার মস্তক ধারণ করত পাপ শান্তির জন্য কাপালিক ব্রত অবলম্বন করণানন্তর ত্রিভুবনে ভিক্ষা করিয়া অবশেষে কাশীধামে গমন করিলেই ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। তখন ব্রহ্মার মস্তক তোমার হস্ত হইতে অধঃপতিত হইবে। হে ভৈরব! মুক্তিপুরী কাশীতে যমরাজের আধিপত্য নাই। অতএব তুমি কাশীতে অবস্থিতি করত তথাকার রাজা হইয়া কাশীবাসী পাপাত্মা জীবগণের দণ্ডবিধান কর।" কালভৈরব মহাদেবের আজ্ঞায় তাহাই স্বীকার করত কাশীক্ষেত্রে বিরাজমান আছেন। কাশীক্ষেত্রে মনুষ্যগণ বিবিধ পাপ কার্য্য করিয়াও যদি কাশীধামে দেহত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহাদিগকে যমের অধিকারে যাইতে হয় না। ঐ সকল জীবগণ মুক্তিক্ষেত্র কাশীতে পাপ কার্য্য করা প্রযুক্ত রুদ্র পিশাচত্ব লাভ করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর কালভৈরবের আজ্ঞায় কঠোর দণ্ড ভোগ করত পরিশেষে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমী তিথিতে বিবিধ উপকরণ দ্বারা কালভৈরবে

পূজা করিলে মানবগণের বার্ষিক বিঘ্ন সকল দূরীকৃত হয়। রবিবার, মঙ্গলবার, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী তিথিতে কালভৈরবের দর্শন ও পূজা করিলে মানবগণ বিবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। পরন্তু মানবগণ কালোদক তীর্থে স্নানান্তে কালভৈরবকে দর্শন ও ঐ জলে পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়।

দণ্ডপাণির আবির্ভাব।

পুরাকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে পরমধার্ম্মিক যক্ষরাজ পূর্ণভদ্র বাস করিতেন। তাঁহার তপস্যা প্রভাবে দেবদেব মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হরিকেশ নামা একটি পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ বালক হরিকেশ অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই পরমশিবভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। ক্রিড়াতেও শিবপূজা এবং বয়স্যদিগের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন হইলে শিবনাম উল্লেখেই আহ্বান করিতেন। ঐ বালক নিদ্রাগত হইলেও স্বপ্নে মহাদেব, ত্রিলোচন ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। পুত্রের এবম্প্রকার ভাব দর্শনে, তাঁহার পিতা পূর্ণভদ্র পুত্রকে গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন। কিন্তু যক্ষরাজ-কুমার হরিকেশ পিতৃবাক্য কর্ণগোচর করিতেন না। একদিন স্বীয় পুত্র হরিকেশ অবাধ্যাচরণ করায় যক্ষরাজ পূর্ণভদ্র তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। বালক হরিকেশ ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া, সাতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একজন সাধু ব্যক্তি কোন সময় তাঁহার নিকট বলিয়াছিল, "মাতাপিতা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কিম্বা

বন্ধুগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তির বারাণসীক্ষেত্রই পরমগতি।” অতএব কাশীক্ষেত্রেই এক্ষণে আমার যাওয়া কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া যক্ষরাজকুমার হরিকেশ আনন্দকাননে উপস্থিত হইয়া দৃঢ় ভক্তির সহিত ভগবান্ চন্দ্রশেখরের তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতিবাহিত হইলে, এক দিন ভগবান্ গিরিশ গিরিজা সহ আনন্দকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাতপা হরিকেশকে দেখিতে পাইলেন। ঐ সময় হরিকেশের কেবলমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, তদ্দ্বারাই তাহার জীবিত থাকা অনুমিত হইতেছে। মহাযোগী তপস্যাপরায়ণ হরিকেশের ঐরূপ অবস্থা অবলোকন করত জগন্মাতা ভবানী অম্বিকা বলিলেন, “হে আশুতোষ, আপনি নিজ ভক্ত ঐ যক্ষকে বরপ্রদানপূর্ব্বক অনুগৃহীত করুন।” তখন ভগবান্ মহেশ্বর কমলকর স্পর্শ দ্বারা হরিকেশের চৈতন্য উৎপাদন পূর্ব্বক বর প্রদান করিলেন; অর্থাৎ বিশ্বনাথ বলিলেন, “হে পরম ভক্ত হরিকেশ! তুমি এই কাশীক্ষেত্রে অবস্থান ও দণ্ডপাণি নামে খ্যাত হইয়া সকলের অগ্রে পূজিত হইবা। যে ব্যক্তি জ্ঞানদ তীর্থে স্নান করত অগ্রে তোমার আরাধনা না করিবে, সে আমার অনুগৃহীত হইতে পারিবে না।” তদবধি দণ্ডপাণির পূজা না করিয়া কেহই কাশীক্ষেত্রে বাস করিতে পারে না। অতএব দণ্ডপাণিও কালভৈরবের অধীনস্থ কাশীক্ষেত্রবাসীগণের একজন দণ্ডবিধাতা।

জ্ঞানবাপীর উৎপত্তি বিবরণ।

পুরাকালে পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী দিগধিপতি শূলধারী ঈশান ভ্রমণ করিতে করিতে মুক্তিদায়িনী কাশী পুরীতে উপনীত

হইয়া জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করত সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহার পূজার উকরণ দ্রব্য চিন্তা করিতে করিতে, জল দ্বারা ঐ মহালিঙ্গের স্নান করানই স্থির করিলেন। তখন জটাধারী দিগধিপতি ঈশান, ক্ষীর ও লবণ সমুদ্র ব্যতীত কোন স্থানে জল না পাইয়া স্বীয় ত্রিশূল দ্বারা ঐ মহালিঙ্গের দক্ষিণ দিকে খনন করত একটি জলময় কুণ্ড নির্ম্মান করিলেন। তখন ঐ কুণ্ডের জলে বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে দিগধিপতি ঈশান, পদ্ম ও পাটল পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধি সুস্বাদু ঐ জল দ্বারা সহস্রধার কলস পূর্ণ করত সহস্রবার ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের প্রতিরূপ ঐ মহালিঙ্গকে স্নান করাইলেন। তখন মহাযোগীশ্বর মহাদেব প্রসন্ন হইয়া রুদ্ররূপী ঈশানকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। ঈশান কহিলেন, "হে মহেশ্বর বিশ্বনাথ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই কুণ্ড ত্রিলোকের সমুদায় তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া শিবতীর্থ নামে খ্যাত হউক।" শিব শব্দের অর্থ জ্ঞান, এই জন্য এই তীর্থের নাম জ্ঞানদ তীর্থ বা জ্ঞানবাপী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই তীর্থের জল স্পর্শ ও তদ্দ্বারা আচমন করিলে মানব সমুদায় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফলভোগী হয়। গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত সিতাষ্টমী তিথিতে যদি ব্যতিপাত যোগ হয়, সেই দিন তথায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে, গয়া হইতে কোটি গুণ অধিক ফললাভ হয়। এবং ঐ শ্রাদ্ধের ফলে পিতৃপুরুষগণ প্রলয় কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করিয়া থাকেন। একাদশীতে উপবাস করিয়া পরদিন ঐ জ্ঞানদ তীর্থ জল তিন গণ্ডুষ মাত্র পান করিলে, তাহার হৃদয়ে নিসন্দেহ তিনটি শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হয়।

———

কাশীক্ষেত্রে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব।

রুরুনামা মহাদৈত্যের দুর্গ নামক পুত্র বহুকাল মহাতপস্যা করত পুরুষ মাত্রেরই অজেয় হইয়াছিল। ঐ মহাসুরের প্রবল প্রতাপে দেবগণ স্বর্গ হইতে পলায়ন এবং ঋষিগণ বৈদিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর দেবগণ মহাবিপদে পতিত হইয়া, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ সমবেত ও মন্ত্রণাপূর্ব্বক ভগবান্ যোগেশ্বর মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা নিবেদন করত বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া জগৎপ্রসবিনী মহামায়া ভগবতীকে বলিলেন। "হে পার্ব্বতি! তুমি মহাসুর দুর্গাসুরকে বধ করিয়া দেবগণ ও ঋষিগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" ভগবতী মহেশ্বরী, মহেশ্বরের আজ্ঞায় তাহা স্বীকার করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে উপনীত হইয়া স্বীয় কিঙ্করী কাল-রাত্রি নাম্নী রুদ্রানীকে বলিলেন, "তুমি অতি সত্বর দুর্গাসুরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান কর।" ত্রিভুবনসুন্দরী কালরাত্রি দুর্গাসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বিশ্বজননী পার্ব্বতীর আদেশ জানাইলেই সসৈন্যে দুর্গাসুর উপস্থিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী জগন্মোহিনী ভবানী দুর্গা-দেবীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল যুদ্ধের পর, দুর্গা-সুর সসৈন্যে মহানিদ্রাভিভূত হইলে দেবগণ সমবেত হইয়া ভগবতী আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন। তদবধি বিশ্বজননী ভবানী পার্ব্বতীর নাম দুর্গাদেবী হইয়াছে। তিনিই কাশীক্ষেত্রের রক্ষার জন্য কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া কাশীপুরী রক্ষা করিতেছেন। অতএব কাশীবাসীগণের এবং যাত্রীগণের দুর্গা-দেবীর দর্শন ও পূজা করা সর্ব্বথা বিধেয়।

অন্য স্থানের ও কাশীক্ষেত্রের উত্তরবাহিনী গঙ্গার মহিমা।

জগজ্জননী ভবানী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ দেবদেব মহেশ্বর শঙ্কর বলিলেন, কলিতে যোগ, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি কিছুই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। জ্ঞানে কি অজ্ঞানে গঙ্গাস্নান করিলে জীবগণ নিষ্পাপ হইয়া থাকে। গঙ্গাতীরে ঘৃত, মধু, তিলসহ পিতৃলোকের পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে পিতৃলোকের স্বর্গবাস হয় এবং স্বর্গবাসী পিতৃলোকের মুক্তি হইয়া থাকে। ঐ পিণ্ড-মধ্যে যত তিল থাকে তত সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত্ নরকস্থ পিতৃলোক স্বর্গবাস করিয়া থাকে। পরন্তু সকল স্থানের গঙ্গাস্নানেই নানাবিধ পাপ দূরীকৃত হয়। গঙ্গাজলে যে কোন প্রকারে, জীবগণের অস্থি পতিত হউক না কেন, ঐ অস্থি যতকাল গঙ্গাজলে অবস্থানকরে, ততকাল তাহার স্বর্গবাস হয়। পুণ্য কার্য্যবিরত নানাবিধ পাপকারী দুর্ব্বৃত্ত, অপঘাত মৃত ব্যক্তির অস্থিও যদি কোনপ্রকারে গঙ্গা-জলে পতিত হয়, তাহা হইলেও তাহার সর্ব্বপ্রকার পাপ রহিত হইয়া স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ঐ সম্বন্ধে আমরা বাহীক নামক একজন ব্রাহ্মণের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে লিখিতেছি। পুরাকালে কলিঙ্গ দেশে বাহীক নামা একজন ব্রাহ্মণ বাস করিত। ঐ ব্রাহ্মণ যত প্রকার পাপ কার্য্য আছে তাহার কিছুই করিতে ত্রুটি করে নাই। পুণ্য কার্য্য দূরে থাকুক ভ্রমেও কোন দিন, স্নান সন্ধ্যাদি নিত্য কার্য্য করে নাই। কেবল নাম মাত্র যজ্ঞ সূত্রধারী ব্রাহ্মণ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণা-ধম ঘটনাক্রমে, দণ্ডকারণ্যে নর-মাংসপ্রিয় ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হত হইয়া-ছিল। অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণের বাম পদগ্রহণ পূর্ব্বক, একটি গৃধ্র পক্ষী আকাশে উড্ডীয়মান হইল। তখন আর একটি গৃধ্র পক্ষী মাংস

লোভে পূর্ব্বোক্ত গৃধ্রের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যে সময় ঐ ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেই সময়ই যমদূতগণ তাহার সূক্ষ্ম-দেহ দৃঢ়রূপে বন্ধন করত যমালয়ে লইয়া যায়। যমরাজ চিত্রগুপ্তের অভিমতানুসারে তাহাকে রৌরব প্রভৃতি অষ্টাদশটি নরকে এক এক কল্প বাসের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। যে সময় যমদূতগণ ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে ঐ নরকে বাহীকের সূক্ষ্ম দেহ লইয়া গেল, সেই সময় পরস্পর আক্রমণকারী মাংসলোলুপ রাগান্ধ গৃধ্রদ্বয় যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা প্রথমোক্ত গৃধ্রের মুখ হইতে ঐ ব্রাহ্মণের বাম পদ নির্ম্মল গঙ্গাজলে নিপতিত হইল। তখন সুরলোক হইতে দিব্য রথ, বাহীক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলে,বাহীক গঙ্গায় অস্থিপতিত হওয়া নিব-ন্ধন দিব্য বেশ ধারণ করত দিব্য বিমানে স্বর্গলোকে গমন করিল।

কাশীক্ষেত্র যে পৃথিবী হইতে পৃথক্ অর্থাৎ মহাদেবের ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত তাহার দৃষ্টান্ত। (প্রত্যক্ষ ও পৌরাণিক)।—

কাশীক্ষেত্র পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, মহাদেবের ত্রিশূলের উপরি সংস্থাপিত, এজন্য পৃথিবী কম্পনে কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। প্রলয়কালে যখন সমুদ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন ভগবান্ বিশ্বেশ্বর স্বকীয় ত্রিশূল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব প্রলয় কালেও ঐ ক্ষেত্রবাসী জীবগণের ভয়ের কারণ নাই। কাশীক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তাহা যে শূন্যে অব-স্থিত, যোগী ও জ্ঞান চক্ষুবিশিষ্ট মনুষ্য ভিন্ন, মূঢ় ও পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে পায় না।

মৃত্যু লক্ষণ।

প্রাণীদিগের মৃত্যু সন্নিকট হইলে যে সমস্ত চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ।—যে ব্যক্তির দক্ষিণ নাসাপুটে দিবারাত্র নিশ্বাস বহে তাহার অখণ্ড আয়ুঃ থাকিলেও সে ব্যক্তি তিন বৎসরের অধিক কাল বাঁচে না। নিশ্বাস-বায়ু নাশাপুট পরিত্যাগ করিয়া যাহার মুখ হইতে প্রবাহিত হয়, তাহার দুই দিনের মধ্যেই পথিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহার বীজ, মল, ক্ষুত, এবং মূত্র এককালীন নিপতিত হয়, সে এক বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মুখে বারি লইয়া দিবাকরের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া, নির্ম্মল আকাশে ফুৎকার প্রদান করত ঐ ফুৎকার প্রদত্ত জলকণা সমূহে ইন্দ্রচাপ দর্শন করিতে না পায়, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যাহার মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে, সে অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদ ও মাতৃমণ্ডপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। * যে ব্যক্তি নীলাদি বর্ণ এবং কটু ও অম্ল প্রভৃতি রস সমূহকে রোগাদি ব্যতিরেকে অন্যথারূপে অবগত হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যাহার ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যু হইবে, তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুষ্ক হইয়া থাকে এবং ঐ সকল স্থান বিবর্ণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তির রেতঃ, হস্তের অঙ্গুলি এবং নেত্রের কোণ নীল বর্ণ হইয়া যায় সে ছয় মাসের মধ্যেই যমপুরীতে গমন করে। মৈথুন সময়ে এবং তাহার পরক্ষণে যে ব্যক্তি হাঁচিয়া থাকে, সে পাঁচ মাসের মধ্যেই যমালয়ে গমন করে। যে ব্যক্তির স্নানান্তেই হৃদয়, চরণদ্বয় ও করদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিন মাস মাত্র জীবন ধারণ করে। ধূলি

* জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগের নাম ধ্রুব, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলের নাম বিষ্ণুপদ, এবং নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগকে মাতৃমণ্ডপ কহা যায়।

বা কর্দ্দমে যাহার পাদের চিহ্ন খণ্ডিতাকৃতি হইয়া পতিত হয়, সে পাঁচ মাসের অধিক বাঁচে না। দেহ নিশ্চল থাকিলেও যাহার ছায়া চঞ্চল হয়, চতুর্থ মাসে যমদূতগণ তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। যে ব্যক্তি নির্ম্মল দর্পণাদিতে স্বীয় প্রতিবিম্বে মস্তক দেখিতে পায় না, সে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। বুদ্ধির বিভ্রম, বাণীস্খলন, আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই ইন্দ্র-চাপ দর্শন, রাত্রিকালে চন্দ্রদ্বয়, দিবাতে সূর্য্যদ্বয় দর্শন, দিবাতে তারকা ও রাত্রিতে তারকা-হীন গগনমণ্ডল দর্শন, এককালীন চতুর্দ্দিকে ইন্দ্র-চাপ মণ্ডল, বৃক্ষোপরি বা পর্ব্বতাগ্রে গন্ধর্ব্ব নগরালয় দর্শন এবং দিবাতে পিশাচ নৃত্য দর্শন, এই সমস্ত আসন্ন মৃত্যুর সূচক হইয়া থাকে। এই সমস্ত চিহ্নের মধ্যে যদি একটি চিহ্নও লক্ষিত হয়, তাহা হইলে মাস মধ্যেই নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণ রুদ্ধ করিয়া কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে না পায় এবং স্থূল হইয়াও হঠাৎ কৃষ এবং কৃষ হইয়াও হঠাৎ স্থূল হয় সে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে স্বীয় শরীর শোণ অর্থাৎ রক্তবর্ণ ও গন্ধপুষ্প বা বস্ত্রের দ্বারা ভূষিত দর্শন করে, সে আট মাস কাল মাত্র জীবিত থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে, ধূলি রাশিতে, বল্মিক রাশিতে, কিম্বা যূপদণ্ডে আরোহণ করে, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত হয়। যে ব্যক্তি সম্মুখে লৌহদণ্ডধর, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণবসনাবৃত পুরুষ দর্শন করে, সে তিন মাস মধ্যেই শমন ভবনে গমন করে। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণা কুমারী, বাহু পাশ দ্বারা যাহাকে বন্ধন করে, সে এক মাসের মধ্যেই শমন ভুবন দর্শন করিয়া থাকে। স্বপ্নে যে ব্যক্তি বানরে আরূঢ় হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে সে পাঁচ দিনের মধ্যেই যমালয় গমন করে। কৃপণ যদি হঠাৎ বদান্য হয় এবং বদান্য ব্যক্তি যদি হঠাৎ কৃপণ হয় এবং অন্ধ

প্রকারেও যদি স্বভাব হঠাৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে। মানবগণ উপরোক্ত মৃত্যুলক্ষণ সকল বা তন্মধ্যে দুই একটি দর্শন করিতে পারিলেই অতি সত্বর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের সুরক্ষিত, যমভয়বারিণী, মুক্তিক্ষেত্র, বারানসী, কাশীর আশ্রয় গ্রহণ করিবেক।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

৮ গয়াধাম।

এই মহাতীর্থস্থান ফল্গুনদীর পশ্চিম তটে, ক্ষুদ্রপর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত। চিরস্মরণীয়া পুণ্যশীলা বিখ্যাতা কীর্ত্তিময়ী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক বিষ্ণুপদ তীর্থোপরি স্বর্ণ কলস ও চক্র শিরোভূষিত বৃহৎ ও অত্যুচ্চ প্রস্তরময় সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের মধ্যভাগে প্রায় দুইহস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত পরিসর এবং এক হস্ত গভীর চতুরস্র স্থানমধ্যে প্রস্তরোপরি বিষ্ণুপদাঙ্ক অঙ্কিত আছে। যাত্রিগণ তথায় পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় তিন ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে অনুমান দুই ক্রোশ। ইষ্টইণ্ডিয়া কর্ড্ লাইনের মিঠাপুর ষ্টেশন হইতে ৮ গয়াধাম পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন গিয়াছে এবং গয়াধামেই একটি বৃহৎ ষ্টেশন আছে। (গয়াধামের পাণ্ডাদিগকে গয়ালী বলে। গয়ালী দিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক কিন্তু সকল গয়ালীই অত্যন্ত ধনশালী। তাহাদের নিযুক্ত বরকন্দাজগণ যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আপন আপন প্রভুর নিকট উপস্থিত করে; সুতরাং বৈদ্যনাথ ষ্টেশনের ন্যায় গয়াষ্টেশনে গয়ালীদিগের যাত্রী সম্বন্ধীয় বিবাদ প্রায়ই উপস্থিত হয়না। এস্থানে পিণ্ড প্রদান সম্বন্ধে গয়ালী দিগেরই বিশেষ কর্ত্তৃত্ব আছে।) তাঁহাদের অনভিমতে কেহই

পিতৃলোকের পিণ্ড প্রদান করিতে পারেনা। (গয়ালীরা তিন প্রকার নিয়মে যাত্রী দিগকে পিণ্ড দেওয়াইয়া থাকেন, যথা খাবরা, দর্শনী, একোদ্দিষ্ট। রামশিলা, প্রেতশিলা প্রভৃতি পর্ব্বতে পিণ্ডদান এবং ফল্গুতে ও গয়াশিরে অর্থাৎ বিষ্ণুপদে ও অক্ষয়বট প্রভৃতি পিণ্ডদানের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বস্থানে পিণ্ডদান করার অধিকারের নাম খাবরা। রাম-শিলা প্রেতশিলা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পিণ্ড দেওয়ার অধিকারের নাম দর্শনী। কেবল মাত্র বিষ্ণুপদ ও ফল্গু এবং অক্ষয় বটে পিণ্ড দানের অধিকারের নাম একোদ্দিষ্ট। খাবরা পিণ্ডদানের দক্ষিণা নিম্নশ্রেণী ষোল টাকা, ঐরূপ দর্শনীর দক্ষিণা ঐ শ্রেণীর দশ টাকা, এবং ঐরূপ একোদ্দিষ্টের নিম্নশ্রেণীর দক্ষিণা পাঁচ টাকা।) গয়ালীরা জাতি ব্রাহ্মণ, তাঁহারা যাত্রীদিগকে যজমান বলিয়া থাকেন। যাত্রীর অবস্থাভেদে ঐ দক্ষিণা দুই শত, পাঁচ শত, সহস্র, দুই সহস্র বা তদ-ধিকও হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর, যেরূপ নূতন বস্ত্র ও নূতন উত্তরীয় বসন পরিধান করিতে হয়, ৺ গয়াধামে পিণ্ড দানের সময়েও ঐরূপ নূতন বস্ত্রযুগল ব্যবহার করিতে হয়। এবং যে কয়েকদিন পিণ্ডদান করিতে হয়, সেই কয়েকদিন এক সন্ধ্যা হবিষ্যান্ন ভোজন করা নিয়ম। গয়ালীরা আপন আপন যাত্রী-দিগের স্নানাদির জন্য ভৃত্য দ্বারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পরিশুষ্কা ফল্গু নদীর বালি রাশি খনন করাইয়া জলোদ্ধার করাইয়া থাকেন। যাত্রিগণ ঐ জলে স্নান ও তর্পণ এবং ঐ জল আনিয়া পিতৃ-লোকের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন এবং বাসায় আনাইয়া পাক কার্য্য নির্ব্বাহ ও পান করিয়া থাকেন। পিণ্ডদান করার সময় গয়ালীর নিযুক্ত এক জন বরকন্দাজ সর্ব্বদাই যাত্রিগণের নিকট উপস্থিত থাকে। যাত্রীদিগের প্রয়োজনীয় সর্ব্ব প্রকারের দ্রব্যাদি ঐ বর-

কন্দাজ ক্রয় করিয়া আনিয়া দেয়। পিণ্ডদান করার সময় গয়ালীর নিযুক্ত এক জন পুরোহিত যাত্রীদিগের সঙ্গে যাইয়া, ফল্গু, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি তীর্থে পিণ্ডদানের কার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করাইয়া থাকেন। ঐ পুরোহিতকে প্রকাশ্যরূপে কিছু দিলে তাহা গয়ালীরা পাইয়া থাকেন, এজন্য পুরোহিতকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা হইলে গোপনে দিতে হয়। পুরোহিত গয়ালীর নিকট দক্ষিণাদি পাইয়া থাকেন। পিণ্ডদানের জন্য যবচূর্ণ, তিল, মধু ইত্যাদি সমুদায় দ্রব্যই অত্যল্প মূল্যে দোকানদারগণ বিক্রয় করিয়া থাকে; তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের সময় পৃথক রূপে প্রত্যেক যাত্রী এক এক টাকা দিলে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পিণ্ডদিতে পারা যায়, নতুবা সকল জাতির লোক একত্রে এক সময়ে বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। রাত্রিকালে বিষ্ণুপদের উপর নানাবিধ পুষ্প, মালা, তুলসী, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা শিঙ্গার হওয়ার নিয়ম আছে। ঐ শিঙ্গার দর্শন করার জন্য যাহারা উক্ত মন্দির মধ্যে যায়, তাহাদের প্রত্যেককে এক একটি পয়সা প্রণামী স্বরূপ দিতে হয়। সর্ব্ব স্থানে পিণ্ডদান সমাধা হইলে শেষ দিন অক্ষয় বটের নিকট পিণ্ড দিতে হয়। ঐ দিন গয়ালী স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। তিনি সফল না বলিলে পিতৃলোকের পিণ্ডদান সফল হয় না। যাত্রীদিগের এইরূপ বিশ্বাস থাকায় ঐ সময় গয়ালী ঠাকুর স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা বুঝিয়া প্রত্যেক যাত্রীর অবস্থানুসারে সহস্র মুদ্রা, পাঁচ শত মুদ্রা, কিম্বা একশত মুদ্রা চাহিয়া থাকে; পঁচিশ টাকার ন্যূন কিছুতেই সফল বলেন না। যাত্রিগণ মহাবিপদগ্রস্ত হইয়া, রৌদ্রে অনাহারে কষ্ট পাইয়াও গয়ালীকর্ত্তৃক পুষ্প মালা দ্বারা করযুগল বন্ধনীকৃত হইয়া, অগত্যা কেহ

সাধ্যের অতিরিক্ত প্রণামী স্বীকার করিয়া গয়ালী দ্বারা সকল বলাইয়া থাকেন। কেহ বা ঐরূপ অর্থ দানের সাধ্য নাই বলিয়া নানারূপ বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকেন। যাহা হউক ঐরূপ দেয় টাকা নগদ্ দিতে না পারিলে গয়ালীগণ খত অর্থাৎ ঋণ গ্রহণ পত্রী লিখাইয়া লন। পাণ্ডার নিযুক্ত পূর্ব্বোক্ত বরকন্দাজকে সাধ্যমত পারিতোষিক দিতে হয়। বাসার কার্য্যের জন্য কর্ম্মকরী নিযুক্ত করিলে উক্ত কর্ম্মকরীকে বেতন দিতে হয়, তদ্ভিন্ন তাহা দ্বারা ফল্গুনদী হইতে যত কলস জল আনান হয়, ততটি পয়সা পৃথক্‌রূপে হিসাব করিয়া দিতে হয়। মেথ-রাণীর বেতন স্বতন্ত্র রূপে দিতে হয়। পাণ্ডাগণ, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ সকল যাত্রীকেই সমানভাবে বাসা দিয়া থাকেন, সুতরাং ইতর বাঙ্গালীরা পায়খানায় মলত্যাগ না করিয়া দালানের ছাদে ও পায়খানার চতুর্দ্দিকে যথেচ্ছ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পথ ঘাট সর্ব্বত্রই মলমূত্র দ্বারা দূষিত থাকে। এ নিমিত্ত তীর্থস্থানের মধ্যে গয়ার তুল্য অস্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। পুষ্করিণীর জলে স্নান কিম্বা ঐ জল পান করিলে সদ্যই জ্বর রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। গয়ার পাণ্ডাপাড়ার রাস্তাগুলি অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও দুর্গন্ধময়ী; সুতরাং পদব্রজে পথে ভ্রমণ করিতেও মনের প্রফুল্লতা অনুভব হয় না। এস্থানে এরূপ দরিদ্র লোক আছে যে, একটি পয়সা ভিক্ষা পাওয়ার প্রত্যাশায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে, অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াও যাত্রিগণ ঐরূপ লোককে ভিক্ষা না দিয়া থাকিতে পারে না। গয়ার জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কার্ত্তিকাদি মাসে তথায় গমন করিলে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হয়, নতুবা বিপদে পড়িতে হয়। গয়ার উত্তর ভাগের নাম সাহেবগঞ্জ। এ স্থানে গবর্ণমেণ্টের নানাবিধ বিচারালয় ও আফিস আছে। গয়াধাম

অপেক্ষা এই স্থানের রাজপথ প্রশস্ত ও পরিস্কৃত। এ স্থানে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যই পাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জ একটি প্রধান জেলা। এ স্থানের জল বায়ু গয়াধাম অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈদ্যনাথ ধাম।

বিশ্বপতি মহেশ্বর চন্দ্রশেখর দেবদেব মহাদেবের কামলিঙ্গ অত্র-ধামে সংস্থাপিত। এই স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি ষ্টেশন আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী পরিখারূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই স্থান ডুমকা জেলা ও সাঁওতাল পর-গণার অন্তর্গত। স্বভাব সৌন্দর্য্যে এতাদৃশ রমণীয় ভূভাগ প্রায় নয়নগোচর হয় না। এই স্থানে প্রায় পাঁচ শত ঘর পাণ্ডা বাবা বৈদ্যনাথের প্রসাদে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। সকল পাণ্ডার বাড়ীতেই সুদৃশ্য হর্ম্ম্য আছে। পুরীর মধ্যস্থলে বাবা বৈদ্য-নাথের প্রস্তরময় অত্যুচ্চ মন্দির স্বর্ণ চূড়া ও পতাকা দ্বারা শোভিত। তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজ-মান। ঐ পুরীর চারি দিকে চারিটি বৃহৎ তোরণ বর্ত্তমান আছে। বৈদ্যনাথের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটিমাত্র দ্বার। মধ্যস্থল সর্ব্বদাই অন্ধকার থাকে, এজন্য তথায় সর্ব্বদাই একটি বৃহৎ ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। ঐ মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রস্তরময় অনাদি কামফল-প্রদ বৈদ্যনাথ নামে শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। ঐ স্থানে গমন ও কথিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, সকল মনুষ্যের মনেই অনির্ব্বচনীয়

ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হয়। তীর্থ-যাত্রিগণ ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলেই যজ্ঞসূত্র, উষ্ণীষ ও কাটা পোষাকধারী ব্রাহ্মণ পাণ্ডাসকল এক খানি খাতা * হস্তে লইয়া সকলেই যাত্রীদিগকে লক্ষ্য করত আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়? পিতার নাম কি? পিতামহের নাম কি? এবং জেলা ইত্যাদিও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ সকল পাণ্ডাকেই ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। যে সকল নূতন যাত্রী অর্থাৎ যাঁহার পিতা পিতামহের নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা নাই, তিনি ষ্টেশনে উপনীত হইলেই শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সকল পাণ্ডাই তাঁহাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তখন পাণ্ডাগণ স্বীয় স্বার্থের জন্য ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎকালে ঐ নূতন যাত্রী এক জন পাণ্ডার নাম করিয়া তাঁহারই যজমান হইবার স্বীকার না করিলে সকল পাণ্ডাই তাঁহার হস্ত ধারণ করত টানাটানি করিতে থাকেন। ঐ সময় নূতন তীর্থযাত্রী যে কি বিপদে পতিত হয়, বোধ হয় পাঠক মহাশয়গণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। যাত্রিগণ কিছু দূর অগ্রসর হইলেই পক্ষীপালক শোভিত ঢোল স্কন্ধে লইয়া ঢোলবাদক সকল তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এবং ঐ ঢোল বাজাইতে বাজাইতে এক একবার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করত পয়সা প্রার্থনা করে এবং মুখে এইরূপ গান করিতে থাকে যথা—"মনে মনে বাসনা পূরণ করো, বোম বোম বৈদ্যনাথ মহেশ্বরো"। ঐ গান এবং বোম ভোলা ইত্যাদি ঢোলের বাজনার ধ্বনি ও ঢুলীদিগের নৃত্য যে কি অনুপম দৃশ্য ও মনোহর ব্যাপার তাহা যিনি

* খাতামধ্যে যাত্রিগণের নাম, ধাম, পিতা, পিতামহের নাম, জেলা, পরগণা ইত্যাদি বিবরণ লিখিত আছে।

একবার ৺ বৈদ্যনাথ ধামে গমন না করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। পাণ্ডারা আপন আপন যাত্রীর বাসা আপন আপন বাড়ীতে দিয়া থাকেন; ঐ বাসা বাড়ীর ভাড়া দেওয়ার নিয়ম নাই। বাসা প্রাপ্ত হইয়া যাত্রিগণ বিশ্রামও মল মূত্র ত্যাগ করত শিবগঙ্গা নাম্নী বৃহৎ দীর্ঘিকাতে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা ইত্যাদি নিত্য-কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, রাবণের মুষ্ট্যাঘাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার উৎপত্তি হওয়ার বহুকাল পরে ঐ স্থানে বৃহৎ একটি দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছে। তদবধি ঐ দীর্ঘিকার নাম শিবগঙ্গা হইয়াছে। ঐ স্থানে অন্ন, বস্ত্র, গোদান করিলে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হয় ইত্যাদি বলিয়া পাণ্ডাগণ আপন আপন যাত্রীদিগকে তথায় দান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। যাত্রিগণ শিবগঙ্গায় স্নানাদি করিলেই, পাণ্ডারা ষোড়শোপচারে ৺ বৈদ্যনাথের পূজার ব্যবস্থা ও পরামর্শ দেন। ঐ পূজার একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। ঐ তালিকা মধ্যে গঙ্গা জলের তুল্য মূল্যবান্ দ্রব্য আর কিছুই নাই। কথিত পুরী মধ্যে গঙ্গাপুত্র নামে, গঙ্গাজল বিক্রেতা এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছে। ঐ গঙ্গাজল বিক্রয়োৎপন্ন টাকার ভাগ পাণ্ডাগণ পাইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১০।১২টি গঙ্গাজল-পূর্ণ শিশির নাম একভার। পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন, গোমুখ পর্ব্বতের গঙ্গাজল এক ভারের মূল্য এক শত টাকা; হরিদ্বারের এক ভার গঙ্গা-জলের মূল্য পঞ্চাশ টাকা; প্রয়াগের একভার গঙ্গাজলের মূল্য পঁচিশ টাকা; নিকটবর্ত্তী একভার গঙ্গাজলের মূল্য দশ টাকা। তাহার পরে যাত্রিগণ ইচ্ছানুসারে ঐ গঙ্গাজল ক্রয় করেন। বস্তুতঃ অত্যল্প মূল্যের গঙ্গাজল অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ এক শিশির মূল্যও দুই আনার কম পাওয়া যায় না। ঐ গঙ্গাজল ব্যতীত ষোড়শোপচারে পূজার

অন্যান্য দ্রব্যও যথারীতি ও অতিরিক্ত তালিকায় লিখিত থাকে। যাত্রীর অবস্থানুসারে এক শত টাকা বা পঞ্চাশ টাকা কিম্বা পঁচিশ টাকা ন্যূন কল্পে দশ টাকা মধ্যে ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। পূজার যোড় মন্দির মধ্যে লইয়া গেলে তাহা প্রধান পাণ্ডার প্রাপ্য হয়, এজন্য পাণ্ডাগণ মন্দিরের বাহিরেই তাহা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। যে সকল যাত্রী ষোড়শোপচারে পূজা না করিয়া ৺বৈদ্যনাথের দর্শন করত বিল্বপত্র, পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা পূজা করণানন্তর ঐ দিনই স্থলান্তরে যাইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট পাণ্ডাগণ ৪।৫ টাকা বা ন্যূন কল্পে ১।০ এক টাকা চারি আনার ন্যূন গ্রহণ করেন না। যাত্রীর অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল বোধ হইলে, তাঁহার নিকট অর্থ গ্রহণের জন্য পাণ্ডাগণ নানা প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করেন। পরিশেষে কোন রূপে টাকা আদায় করিতে না পারিলে সফল দেওয়া ও ব্রাহ্মণ ভোজন করানের জন্য কিছু টাকা আদায় না করিয়া ছাড়েন না। ব্রাহ্মণ ভোজন যাত্রীর বাসায় হওয়ার নিয়ম নাই। তালিকা অনুসারে পাণ্ডাকে টাকা দিতে হয়, পাণ্ডা স্বীয় বাড়ীতে তাঁহার বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে ৺বৈদ্যনাথের পূজা আরম্ভ হয়। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি, অতি প্রত্যূষে বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাইয়া চন্দ্রকূপের * জল দিয়া ভক্তিযোগে পূজা করিয়া থাকেন। তাহার পরে প্রধান পাণ্ডার পূজা হয়, ঐ পূজার পরে যাত্রিগণ, কেহ ষোড়শোপচারে কেহ পঞ্চামৃত ও নানাবিধ পুষ্প ও বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। কেহ বা হরিদ্বার,

---

* প্রবাদ আছে এই কূপটিও রাবণের মুষ্ট্যাঘাতে উৎপন্ন হইয়া পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গা আবির্ভূতা হন।

প্রয়াগ প্রভৃতি স্থান হইতে এক ভার গঙ্গাজল বহুকষ্টে ও বহু দিনে আনয়ন করত ঐ গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইয়াই পূজা সম্পন্ন করে। শেষোক্ত প্রকার পূজা পশ্চিম দেশীয় লোক ভিন্ন বাঙ্গালি লোক করে না। উপরোক্ত নিয়মে প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করত প্রায় তিন প্রহর পর্য্যন্ত ৺ বৈদ্যনাথের পূজা হয়। তাহার পরে পূজার ফুল বিল্বপত্রাদি ঝাঁকায় ভরিয়া পশ্চিম দ্বারের নিকট এক স্থানে ভৃত্যগণ ফেলাইয়া দেয়। ঐ ফুল ও বিল্বপত্র ন্যূনকল্পে চারি পাঁচ গাড়ী হইবে। স্নানীয় জল বাহির হওয়ার জন্য একটা নালা প্রস্তুত আছে, ঐ নালা দ্বারা স্নানীয় জল মন্দিরের উত্তর দিকস্থ একটি কুণ্ড মধ্যে সঞ্চিত হইয়া, তথা হইতে আর একটি নালা দ্বারা পশ্চিম দ্বারের বাহিরে যায়। যাত্রিগণ ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড হইতে স্নানীয় জল লইয়া পান করিয়া থাকেন। প্রতিদিন তিন প্রহরের পরে দুই ঘণ্টাকাল মন্দিরের কপাট বন্ধ থাকে, সন্ধ্যাকালে পুনরায় ঐ দ্বার মুক্ত হয়। প্রতিদিন যথানিয়মে রসনচৌকি বাজনা হইয়া থাকে, সায়ংকালে আরতি হয়, তাহার পরে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত শিঙ্গার হয়। † শিঙ্গারের পরে মতিচুরের লাড়ুর ন্যায় এক প্রকার লাড়ু দ্বারা জল-পানীয় ভোগ দেওয়া হয়। ঐ লাড়ু প্রধান পাণ্ডার প্রদত্ত। ফল, মূল, সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, ভিন্ন কোন প্রকার অন্ন ভোগ দেওয়ার নিয়ম নাই। প্রতিদিন তিন বার যাত্রীর গাড়ী ষ্টেশনে আগত হয়। দৈনিক গড়ে বোধ হয় ৩।৪ সহস্র যাত্রী ৺ বৈদ্যনাথ ধামে আগমন করিয়া থাকেন। শিবরাত্রির সময় লক্ষাধিক যাত্রী আগমন করিয়া থাকেন। শিবরাত্রির বিবরণ অতঃপর বর্ণিত হইবে। যিনি পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাজল একভার ক্রয় করিয়া ষোড়শোপচারে ৺ বৈদ্যনাথের পূজা করেন,

† শিঙ্গার অর্থ ফুলের মালা চন্দন ও বিল্বপত্র দ্বারা ৺ বৈদ্যনাথকে সাজান।

তাঁহাকে কথিত গঙ্গাজলের শিশিগুলি দুইটি বাঁশের পেটরা মধ্যে ভরিয়া ভার বহনের প্রণালী অনুসারে স্কন্ধে ঐ গঙ্গা জলের ভার লইয়া ৺ বৈদ্যনাথের মন্দির সপ্তমবার প্রদক্ষিণ করিয়া, পরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করত পূজা করিতে হয়। ঐ সময় দ্বার বন্ধের জন্য পৃথক রূপে দ্বারপ্রহরী পাণ্ডাকে এক টাকা দিলে দ্বার বন্ধ করিয়া ষোড়শোপচারে স্বেচ্ছামত পূজা করিতে পারা যায়

ধর্ণা বা হত্যা দেওয়ার বিবরণ।

৺ বৈদ্যনাথের মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম দিকে বারান্দা সংযোজিত আছে। যাত্রিগণ নানাবিধ কামনা সিদ্ধি ও বিবিধ ব্যাধি আরোগ্য জন্য ঐ বারান্দায় ধর্ণা দেয়। কম্বল কি রেশমি ও পশমি কাপড় শিবগঙ্গায় ধৌত করত দুগ্ধান্ন কিম্বা দধি সহযোগে অন্ন ভোজন করিয়া সন্ধ্যাকালে স্বীয় পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ধৌত বস্ত্র গুলি প্রোক্ত বারান্দায় বিছানা করিয়া এবং প্রয়োজন হইলে ঐ বস্ত্রের কতক শীত নিবারণ জন্য গাত্রাবরণার্থ রাখিয়া, মানস করত ঘৃতের একটি প্রদীপ জ্বালিয়া ঐ বারান্দায় শয়ন করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত বাবা বৈদ্যনাথের কোন আদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত অনাহারে তথায় শয়ন করিয়া থাকার নামই ধর্ণা দেওয়া। যথা সময় ও প্রয়োজন মত মল মূত্র ত্যাগ জন্য স্থানান্তরে যাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে ধর্ণা দেওয়ার ব্যাঘাত হয় না। সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া থাকিতে না পারিলে, সন্ধ্যার সময় ফল, মূল, দধি, সন্দেশ বাবা বৈদ্যনাথকে ভোগ দিয়া ঐ ভোগের প্রসাদ ভক্ষণ

করারও নিয়ম আছে। * ঐ নিয়মে ৫।৬ দিন কেহ বা একুশ দিন পর্য্যন্ত ধর্ণা দিয়া যখন স্বপ্নাবস্থায় কোন ঔষধ প্রাপ্ত কি কোন আদেশ প্রাপ্ত হয়, তখনই ধর্ণা হইতে উঠিয়া বাসায় যাইয়া থাকে। অতঃপর ইচ্ছামত পূজা ও ভোগ দিয়া যথেচ্ছ গমন কর্ত্তব্য। লেখক স্বয়ংই বহুমূত্র রোগে বিশেষ আক্রান্ত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ছয় দিন ধর্ণা দেওয়ার পরে একটি ঔষধ স্বপ্নযোগে পাওয়ায় ঐ ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। প্রধান পাণ্ডার নিযুক্ত একটি প্রহরী আছে, সে রাত্রিকালে যে সকল ব্যক্তি ধর্ণা দেয়, তাহাদের নিকট এক একটি পয়সা লইয়া থাকে। ঐরূপ ধর্ণা দেওয়া লোকের সংখ্যা প্রতি দিন প্রায় দেড় শত পরিমাণ থাকে। কতক লোক আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যায় এবং কতক লোক নূতন আগমন করিয়া ধর্ণা দেয় তথাচ দেখিতে গড়ে প্রায় দেড় শত পরিমাণ ধর্ণা দেওয়া লোক প্রতি দিনই পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে,—ত্রেতাযুগে লঙ্কাধিপতি দশাননের সহিত বিষ্ণু-অবতার শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হইলে দশানন ভয় প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ চন্দ্রচূড়কে লঙ্কায় আনয়নার্থ কৈলাসে গমন করত দেবাদিদেব মহাদেবকে লঙ্কায় লইয়া যাওয়ার জন্য বহুবিধ স্তব স্তুতি করিলে, ভগবান্ আশুতোষ তদীয় কামফলপ্রদ মহালিঙ্গ লঙ্কায় লইয়া যাওয়ার আদেশ করেন, এবং রাবণকে বিশেষরূপে বলিয়া দেন যে, এই অভীষ্ট ফলপ্রদ মহা-লিঙ্গকে কোন স্থানে রাখিলে তথা হইতে আর লঙ্কায় লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না। দশানন ভগবান্ ধূর্জ্জটির আদেশ ক্রমে পূর্ব্বোক্ত কামলিঙ্গ লইয়া লঙ্কাভিমুখে যাইতেছেন, ইতিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র

* এই ব্যবহারটি ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ; কারণ শিব নির্ম্মাল্য বিষবৎ পরিত্যাজ্য, ইহা কাশী খণ্ডে বর্ণিত আছে।

প্রভৃতি জানিতে পারিয়া গোলোকপতি চক্রপাণি বিষ্ণুর নিকট পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলে বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অভয় বাক্য প্রদান করত স্বয়ংই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন। দশানন! তুমি আচমন না করিয়া মহাদেবের কামলিঙ্গ লঙ্কায় লইয়া যাইতেছ, ইহাতে তোমার বিশেষ প্রত্যবায় হইয়াছে। অতএব সত্বর তুমি আচমন দ্বারা শুদ্ধতা লাভ কর। দশগ্রীব লঙ্কাধিপতি এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া আচমন করা মাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণের মন্ত্রণাক্রমে বরুণদেব রাবণের উদরমধ্যে প্রবেশ করত রাবণের দুঃসহ প্রস্রাবের পীড়া উপস্থিত করিলেন। তখন রাবণ প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিলেন, "হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক এই কামফলপ্রদ শিবলিঙ্গটিকে হস্তে ধারণ করুন, আমি মূত্র ত্যাগ করিয়া সত্বরই এই স্থানে আসিয়া ঐ শিব লিঙ্গটি গ্রহণ করিব।" ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়াছি সুতরাং ঐ শিবলিঙ্গ হস্তে ধারণ করিয়া রাখা আমার শক্তি নাই।" রাবণ নানাপ্রকার স্তুতিপূর্ব্বক কহিলেন, "অল্পক্ষণ মাত্র আপনি শিবলিঙ্গ হস্তে ধারণ করিয়া রাখুন, আমি অতি শীঘ্র পুনঃ গ্রহণ করিব।" ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি যথাশক্তি হস্তে ধারণ করিয়া রাখিব, যখন অসমর্থ হইব, তখন এই শিবলিঙ্গ এই স্থানেই রাখিব।" অতঃপর লঙ্কাপতি রক্ষেশ্বর প্রস্রাবত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রস্রাব মহাবেগে নির্গত হইতে লাগিল, তাহাতেই কর্ম্মনাশা নাম্নী নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ নদীতে স্নান করিলে মনুষ্যের পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। এক্ষণে ঐ নদীর পরিচিহ্ন মাত্র আছে। রাবণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন,

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় নাই ; কামময় শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় রক্ষিত হইয়াছেন। তখন মহাদেবের বাক্য রাবণের স্মৃতি পথে উদয় হওয়ায় দশানন অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন এবং কামময় শিবলিঙ্গকে বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের নাম পূর্ব্বে হরিতকী বন ছিল, তথায় পূজার উপকরণ অথবা জল পাওয়ার উপায় না থাকায়, রাবণের মুষ্ট্যাঘাতে শিবগঙ্গা ও চন্দ্রকূপের উৎপত্তি হইয়াছিল। রাবণ ঐ জল দ্বারা ও অরণ্য হইতে বিবিধ ফুল সংগ্রহ করত কথিত কামলিঙ্গের পূজা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই ঐ কামলিঙ্গকে লঙ্কায় লইয়া যাইতে পারিলেন না। পরিশেষে রাবণ নিতান্ত দুঃখিত ও ক্রোধপরবশ হইয়া কথিত কামলিঙ্গের মস্তকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন ; এক্ষণেও দেখা যায় বৈদ্যনাথের মস্তকের পূর্ব্ব দিকে কোন রূপ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় একটি চিহ্ন আছে। ঐ ঘটনার পরে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ৺ বৈদ্যনাথের পূজাদি বনবাসী তাপসগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত। কলিকালের প্রথমেই ঐ হরিতকী বনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে বৈজু গোয়ালা অর্থাৎ বৈদ্যনাথ ঘোষ নামা এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার বিশেষ তপস্যা ও পুণ্য বল থাকায়, সে গোচারণ করিতে করিতে ঐ হরিতকী বনে যাইয়া দেখিল, দুগ্ধবতী গাভীগণ স্বীয় স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা ঐ কামলিঙ্গের পূজা করিতেছে। তখন বৈজু নিতান্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া, অরণ্য হইতে ফুল, ফল, জল ইত্যাদি আনিয়া ঐ কামময় মহালিঙ্গের পূজা করিল এবং চন্দন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, বেলের কাষ্ঠ প্রস্তরে ঘর্ষণ করত চন্দনের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তদ্দারাই চন্দনের কার্য্য সম্পন্ন করিল। এই রূপে বৈজু গোয়ালা ৺ বৈদ্যনাথের পূজা করত যখন যাহা প্রার্থনা করিত তাহাই সফল হইত। ক্রমশঃ ঐ সম্বাদ গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হও-

প্রায় সকল গ্রামবাসী মনুষ্যগণ আসিয়া ৺ বৈদ্যনাথের পূজা করিত এবং অভীষ্ট বিষয় কামনা করিলে তাহা সিদ্ধি হইত। এক্ষণেও বৈজু গোয়ালার আবিষ্কৃত বেলের চন্দন ৺বৈদ্যনাথের পূজায় ব্যবহার হয়। বৈজু অর্থাৎ বৈদ্যনাথ গোয়াল কর্ত্তৃক কথিত মহালিঙ্গ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং রাবণ কর্ত্তৃক আনিত হওয়ায় রাবণেশ্বর বৈদ্যনাথ নামে ঐ কামলিঙ্গের পূজা হইয়া থাকে। ৺ বৈদ্যনাথ দেবের পুরীর বাহিরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে চির বিখ্যাত বৈজুর মন্দির নামে একটি মন্দির আছে। ৺ বৈদ্যনাথ ধামের জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বিশেষতঃ প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র, শুক্রদূষিত রোগীর পক্ষে এই স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এই স্থানে যমুনা ঝোর নামে একটি পরিশুষ্কবৎ ক্ষুদ্র নদী আছে তাহার জল অতীব সুপেয় কিন্তু প্রমেহাদি পীড়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে পর্ব্বতের ঝর্ণার জল অত্যন্ত উপকারী। এই স্থানে আম্র, কাঁঠাল, আতা, পেয়ারা, কুল, বেল প্রভৃতি সুস্বাদু ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নানাবিধ দাইল এবং উত্তম তণ্ডুল এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন এখানে যথেষ্ট ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে সদ্য ছাগমাংস ও বিবিধ ক্ষুদ্র মৎস্য পাওয়া যায়। পার্ব্বতীয় ভূমি নিবন্ধন, এথাকার বার্ত্তাকু, অলাবু প্রভৃতি সমুদায় তরকারীই অত্যন্ত শক্ত, সহজে সিদ্ধ করা দুঃসাধ্য। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত থাকা প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালেও এই স্থান বিশেষ গরম বোধ হয় না। (শিবরাত্রের সময় এখানে প্রায় এক লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়। তখন প্রান্তরে, বৃক্ষমূলে, লোকালয়ে সর্ব্বত্রই লোকারণ্য হয়। "কেহ বা বোম বৈদ্যনাথ, কেহ বা বোম মহাদেব ধ্বনি করায়" অতি অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মভাব সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে উদিত হয়। ঐ সকল যাত্রীর মধ্যে, প্রায় বিশ সহস্র পশ্চিম দেশীয় যাত্রী, কেহ বা

হরিদ্বার, কেহ বা প্রয়াগ, এবং কোন ব্যক্তি বারাণসী ও কেহ নিকট-বর্ত্তী পবিত্রসলিলা গঙ্গার জল ভার বংশ দণ্ডে সংযোজিত করিয়া স্কন্ধদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐ বংশ দণ্ডের সহিত নিশান ও ঘণ্টা বাঁধিয়া মহানন্দে দলে দলে পদব্রজে যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিয়া ভজন গান করিতে করিতে ৺ বৈদ্যনাথের পুরীতে উপস্থিত হয়। তাহাদের পূজার ফুল, বিল্বপত্রাদি কিছুই আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র ঐ সকল গঙ্গাবারি ৺ বৈদ্যনাথের মস্তকে ঢালিয়া দিয়াই মানসোপচারে পূজা করিয়া থাকে। পাঠক! তাহাদের ভক্তিভাব দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হয় এবং তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। ঐ সময় সকল মনুষ্যই বাবা বৈদ্যনাথের দর্শন ও পূজা করার জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়। পুলিস প্রহরীরাও সময়ে সময়ে লোক বিশেষকে কশাঘাত করার ক্রটী করে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাবা বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্যে একটি লোককেও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না।) পারণের দিন লোক কমিতে আরম্ভ হয়; ৩।৪ দিনে প্রায় সকল লোকই স্ব স্ব অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

তীর্থরাজ প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং নৈমিষারণ্যের বিবরণ।

সুপ্রসিদ্ধ এলাহাবাদ দুর্গের পূর্ব্ব দিকে বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য বালুকাময়ী ভূমি অতিক্রম করিয়া তীর্থরাজ প্রয়াগ ঘাটে যাইতে হয়। বর্ষাকালে যে সকল যাত্রী যাইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঐ বালুকাময় প্রান্তর অতিক্রম করিতে হয় না। তৎকালে ঐ স্থান জলমগ্ন থাকে সুতরাং ঐ সময় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলিত স্থানের পারেই স্নান-ঘাট হয়। ঐ তীর্থ স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুসংখ্যক পতাকা সকল, হস্তী, অশ্ব, প্রভৃতি পশু এবং নানাবিধ পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা পরিচিহ্নিত আছে। এথাকার পাণ্ডাদিগকে প্রয়াগী বলে। ঐ পাণ্ডাগণ আপন আপন যাত্রীদিগকে চিনিবার জন্য ঐ প্রতিমূর্ত্তিবিশিষ্ট পতাকা উচ্চ বাঁশের অগ্রভাগে সংযোজিত করিয়া স্নান-ঘাটে প্রোথিত করিয়া রাখে। ঐ সকল পতাকা অত্যন্ত সুদৃশ্য, তাহারা পবনবেগে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইতে থাকে। পতাকাবলীর অগ্রভাগ বায়ু প্রবাহে পরিচালিত হওয়ায়, বোধ হয় যেন, তাহারা পাপ সকলকে ঐ স্থানে যাইতে নিষেধ করিতেছে। যাত্রীগণ আপন আপন পাণ্ডার পতাকা-

চিহ্ন দৃষ্টি করিয়া স্নানঘাটে উপস্থিত হয়। ঐ পতাকাশ্রেণী-সংলগ্ন কাষ্ঠাসনে পাণ্ডার নিযুক্ত এক এক জন পুরোহিত উপবিষ্ট থাকে। নরসুন্দরগণও ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে। ঐ তীর্থের রীত্যনুসারে সধবা স্ত্রীলোকদিগের কেশের অগ্রভাগ ছেদন করিতে হয় এবং বিধবাদিগের সমস্ত মস্তকের কেশ মুড়িয়া দিতে হয়। পুরুষগণ ও সমুদায় মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু ফেলাইয়া থাকে। ঐ স্থানে কেশ-ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকে; সুদীর্ঘ কেশগুলি ঐ তীর্থ জলে ফেলাইয়া দিলে তাহারা বিক্রয়ার্থ ধরিয়া লয়। তাহার পরে ঐ স্থানে স্নান ও তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ করার নিয়ম আছে। ঐ স্থানে স্নান করিলেই শরীরটি পবিত্র হওয়া অনুমিত হয়। ঐ স্থানে তীর্থময়ী গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতী মিলিতা হইয়াছেন; গঙ্গাজল ধবল বর্ণ এবং যমুনার জল ঈষৎ নীল বর্ণ দেখা যায়। ঐ তিনটি নদী মিলিত হওয়ার জন্যই ঐ স্নান-ঘাটের নাম ত্রিবেণী হইয়াছে। ঐ ঘাট হইতে কিয়দ্দূর ব্যবধান উত্তর দিকে ভগবান্ অচ্যুত বেণীমাধব নাম ধারণ করত বিরাজমান আছেন। ঐ স্থানে স্নানাদি সম্পন্ন করত ভগবান্ বেণীমাধবের পূজা করিয়া দুর্গমধ্যে অক্ষয় বট দর্শন করার জন্য যাওয়ার রীতি আছে। কিন্তু এক্ষণে দুর্গ মধ্যে যাইয়া অক্ষয় বট দর্শন ও ভীমের গদা দর্শন করা সকল যাত্রীর ভাগ্যে ঘটে না। কারণ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আধুনিক আইনানুসারে ঐ দুর্গের প্রধান সেনাপতির নিকট আবেদন করত তাঁহার আজ্ঞামত এক জন পরিদর্শক সৈন্য ও আজ্ঞাপত্রী না পাইলে, কেহই ঐ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণ যাত্রীদিগের এরূপ কার্য্য করিয়া অক্ষয় বট দর্শন ও ভীমের গদা দর্শন ঘটিয়া উঠেনা। প্রোক্ত গদাটি প্রস্তরময়, লম্বা প্রায় ৪৩ ফুট, স্থূল ভাগের পরিধি ৩ ফুট। ঐ স্থূল ভাগ হইতে পরিধি

ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। সুতরাং গদার আকৃতির সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায়, পুরাকাল হইতে তাহার নাম ভীমের গদা বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ দুর্গটি দশ কোণ বিশিষ্ট এবং সুদৃঢ় ও দুরাক্রম্য। মহাত্মা আকবর বাদসাহের সময় এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় ভারতবর্ষে এরূপ বৃহৎ ও সুন্দর দুর্গ আর নাই। তীর্থ কৃত্য সমাধান্তে পাণ্ডার বাড়ীতে যাইয়া আহারাদি করিলেই "সফল" বাক্য বলার জন্য পাণ্ডা মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন দুরাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির জন্য যাত্রীর সহিত তাহার বিবাদ হইতে থাকে। নানা প্রকার বাগ্ বিতণ্ডার পর অবশেষে প্রত্যেক যাত্রী এক টাকা কি হীনাবস্থা নিবন্ধন আট আনাও দিয়া থাকে। বাস্তবিক প্রয়াগের পাণ্ডাদিগের ন্যায় অভদ্র লোক পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। অতঃপর মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রম দেখার জন্য প্রয়াগের উত্তর-পশ্চিমদিকে অধিকাংশ যাত্রীই যাইয়া থাকেন। ঐ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। ঐ স্থানে মাঘ মাসে কল্প বাস করিলে আর মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয় না। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানে অর্থাৎ প্রয়াগ তীর্থে যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া স্নান করে, তাহার সেই কামনা সিদ্ধি হয়। এই স্থানে সর্ব্ব প্রকার সুখাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অযোধ্যা বা রামগয়াতীর্থ।

সরযূনদীর দক্ষিণ তীরে অযোধ্যা বা রামগয়াতীর্থ। যে স্থানে ভগবান্ ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন,

তথায় ঐ মহাতীর্থ স্থান হইয়াছে। সাতটি মুক্তি পুরীর মধ্যে অযোধ্যাও পরিগণিত। ঐ স্থানে স্নান ও পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় এবং পিতৃলোক স্বর্গবাসী হইয়া থাকেন। এখাকার পাণ্ডাগণ অপেক্ষাকৃত ভদ্র লোক, তাঁহারা যাত্রীদিগের প্রতি বিশেষ অসদ্ব্যবহার করেন না। ঐ স্থানে "রামগয়া ও স্বর্গদ্বার" উল্লেখে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে হয়। আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের অযোধ্যায় একটি ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের প্রায় এক মাইল উত্তরে মহামুনি বশিষ্ঠের আশ্রম; ঐ আশ্রমের নিকট একটি কুণ্ড আছে, তাহাকে বশিষ্ঠকুণ্ড বলিয়া থাকে। ঐ আশ্রম পরম পবিত্র স্থান এবং নানাবিধ বৃক্ষলতাদি দ্বারা নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত। ঐ স্থানের কিয়দ্দূর ব্যবধানে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান, রাজা দশরথের রাজভবন, হনুমান গড় ইত্যাদি অনেকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান আছে; কিন্তু সকল স্থানেই কেবল মাত্র শ্রীরাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, রাজা দশরথ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি দর্শন ভিন্ন আর আশ্চর্য্যজনক কিছুই নাই। এ স্থানে বানরের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য; বিশেষ সতর্ক না থাকিলে খাদ্য দ্রব্য প্রায়ই বানরকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। এ স্থানে সুখাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

নৈমিষারণ্য।

আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের বাখইল ষ্টেসন হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ ব্যবধান এই তীর্থ-স্থান। পুরাণে ঐ স্থানের আর একটি নাম দধীচি তীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পদব্রজে, গো-শকটে, এবং অশ্বের গাড়ীতে ঐ স্থানে যাওয়া যায়। ঐ স্থানে পুরাকালে দধীচি

মুনির আশ্রম ছিল, দেবশত্রু মহাবল ইন্দ্রত্রাস অজেয় নিধনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতির প্রার্থনামত দধীচি মুনি স্বীয় অস্থি প্রদান নিমিত্ত স্বকীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদবধি ঐ স্থান সর্ব্ব তীর্থময় হইয়াছে। অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ব্যাসও ঐ স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ স্থানটি অতীব পবিত্র এবং দৃষ্টি মাত্রই তপস্যার যোগ্য স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। এক্ষণেও এই স্থানে প্রধান প্রধান তপস্বীগণ অবস্থিতি করিতেছেন। এথাকার পাণ্ডাগণ অভদ্রাচরণ করেন না। এখানে সুখাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন এবং পুষ্কর তীর্থ।

মথুরা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি শাখা মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। মথুরাতে একটি প্রধান ষ্টেসন আছে। ঐ মথুরা একটি প্রধান তীর্থস্থান। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারবতী এই ছয়টি স্থানে জীবগণ দেহত্যাগ করিলে, বহুকাল স্বর্গবাস করতঃ পরজন্মে কাশীতে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ঐ মথুরা নগরের দৃশ্য অতি রমণীয়। কাশীর ন্যায় দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি নানাবিধ পরমসুন্দর হর্ম্ম্য সকল পরিশোভিত আছে। অত্রত্য পূর্ব্বতন অধিপতি রাজা জয়সিংহের নির্ম্মিত অত্যুচ্চ মান-মন্দির অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। এই নগর যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। যমুনার ঘাটসমূহ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল ঘাট নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা সুশোভিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ধ্রুব-ঘাট ও বিশ্রাম-ঘাট পিতৃলোকের পিণ্ডদানের স্থান। এথাকার পাণ্ডাগণ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট এক টাকা হিসাবে লইয়া থাকে, হীনাবস্থাপন্ন লোকের নিকট তদপেক্ষা ন্যূনও লইয়া থাকে। এথা-

কার এক জন প্রধান পাণ্ডার বহুতর বরকন্দাজ আছে, তাহারা প্রায়ই যাত্রীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকে, "ভুলিও না মাই কান মে লাড়ু সাড়েসাত ভাই" (অর্থাৎ ঐ প্রধান পাণ্ডার কর্ণের নিকট একটি আবরোগ আছে এবং তাহাদের আট ভাইর মধ্যে সাত জন বিবাহ করিয়াছে, এক জন বিবাহ করে নাই।) ঐ ঘাটে স্নান করিতে গেলেই বৃহদাকার কচ্ছপ সকল দৃষ্ট হয় সুতরাং যাত্রীগণ কূর্ম্মভয়ে সন্ত্রাসিত হইয়া উত্তমরূপে অবগাহন করিতে পারে না। এ স্থানে বানরের ভয়ও বিলক্ষণ আছে। বানর সকল যাত্রীগণের আহারীয় দ্রব্য সুযোগ পাইলেই অপহরণ করে। এই স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বৃহৎ একটি জেলা ও একটি দুর্গ আছে। রাজা জয়সিংহের দুর্গের কেবল মাত্র ভগ্নাবশেষ আছে।

এখানে সর্ব্বপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্য সুলভ মূল্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

এই স্থান অতি পবিত্র ও প্রধান তীর্থ। ইহার উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে পুণ্যসলিলা যমুনা নদী পরিখারূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। এই স্থানের বৃক্ষলতাদির সুদৃশ্যতার সহিত অন্য কোন স্থানের বৃক্ষলতাদির সৌন্দর্য্যের তুলনা করা যায় না। এথাকার পাণ্ডাদিগের নাম ব্রজবাসী; তাহারা ব্রাহ্মণ। ঐ ব্রজবাসীগণ যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া চতুরশীতি ক্রোশ পরিমিত ব্রজধাম যাত্রীগণের ইচ্ছামত দর্শন করায়। এথাকার প্রত্যেকটি বাড়ীর নাম "কুঞ্জ।" সুতরাং যাত্রীগণকে

যে স্থানে বাস করিয়া থাকে তাহারও নাম কুঞ্জ। ঐ বাড়ীর অধিপতির সাধারণ নাম কুঞ্জবাসী। বৃন্দাবনের আদি গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ঠাকুরকে আরঙ্গজিব বাদসাহের ভয়ে জয়পুরের কোন এক রাজা রাত্রিকালে লইয়া গিয়া জয়পুর রাজধানীতে স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে ঐ তিন ঠাকুরের মন্দিরের নিকটই আর তিনটি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছেন। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পূজা, ভোগাদিও প্রথমোক্ত গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ঠাকুরের পূজাদির ন্যায় হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরাধিকার প্রতিমূর্ত্তি যে কত স্থাপিত আছেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। ঐ গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে প্রণামী বাবদ যাত্রীগণ যে টাকা দিয়া থাকে, তাহার সাধারণ নাম ভেট। যাহারা দুই টাকা ভেট দেয়, তাহাদিগকে লালযাত্রী বলে। ঐ লালযাত্রীগণ ঐ দুই টাকা যে দিন দেয়, সেই দিন উপহার স্বরূপ দুই হাত পরিমাণ রক্তবর্ণের বস্ত্র ও পাঁচটি মতিচুরের লাড়ু পাইয়া থাকে। দুই টাকার ন্যূন যাহারা ভেট দেয় তাহাদের নাম কাঙ্গাল যাত্রী। তাহারা পূর্ব্বোক্ত লাড়ু ভিন্ন রক্ত বস্ত্র খণ্ড পায় না। ঐ তিনটি দেবালয়ে যত টাকা ভেট দেওয়া হয়, সেই নিয়মে শাক্ত কি বৈষ্ণব যিনি যে মতাবলম্বী হন, তাঁহার স্বীয় ইষ্ট দেব দেবীর কুঞ্জে ঐ নিয়মে ভেট দিতে হয়, এবং যাঁহার বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকা হয় তিনি বাসা ভাড়া গ্রহণ করেন না, তিনিও ঐ নিয়মে ভেট লইয়া থাকেন। অতএব শ্রীবৃন্দাবন ধামে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি স্থানে ভেট দেওয়ার নিয়ম আছে। শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জবন ও নিধুবনে যে সকল আশ্চর্য্যজনক মনোহর বৃক্ষ লতাদি আছে

অন্ত কোন স্থানে সে রূপ বৃক্ষ লতাদি দৃষ্ট হয় না। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ৬।৭ ক্রোশ ব্যবধান, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরি গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন গিরি কেবল নাম মাত্রই আছে, অর্থাৎ ৭।৮ হাতের বেশী উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রজবাসীগণ বলিয়া থাকেন, গোবর্দ্ধন গিরি ভূগর্ভে ক্রমশই বসিয়া যাইতেছে। নিকুঞ্জ বনে মনোহর একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছেন। ঐ স্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজবাসিনী স্ত্রীলোকগণ ভজন গান করিয়া থাকে। যাত্রিগণ তথায় ১।০ আনা দিলেই তত্রত্য তত্ত্বাবধায়ক যাত্রীর ইচ্ছামত কোন এক দিন রাত্রিকালে "ফুল শয্যা" দিয়া থাকে। ঐ ফুল শয্যায়, নানাবিধ সুগন্ধি ফুল ও ফুলের মালা, ফুলের বিছানা এবং ফুলের মশারি এবং মিষ্টান্ন ২।৩ প্রকার ঐ মন্দির মধ্যে যথাযোগ্য মত সাজাইয়া রাখিয়া চাবি বন্ধ করত চাবি যাত্রীর নিকটই দেওয়া হয়। অতি প্রত্যূষে ব্রজবাসী সহ ঐ যাত্রী তথায় যাইয়া চাবি খুলিয়া দর্শন করিয়া থাকে। তৎকালে দেখা যায় ঐ ফুল শয্যাদি যেন কেহ ব্যবহার করিয়াছে, এবং খাদ্য দ্রব্যও কতক কতক ভক্ষণ করিয়াছে এমত অনুভব হয়। তদ্দৃষ্টে ব্রজবাসীগণ বলিয়া থাকেন, "শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা গত রাত্রিযোগে ঐ ফুলের বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ঐ বিছানাদি ব্যবহৃত ও খাদ্য দ্রব্য ভক্ষিত হইয়াছে। অতএব মহাশয়, আপনার পরম সৌভাগ্য তাহার সন্দেহ নাই।" এস্থানে দরিদ্র লোকও বহুতর আছে। দরিদ্র বালকগণ এক কি অর্দ্ধ পয়সার প্রত্যাশায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের সঙ্গে এই কথাগুলি গানের ন্যায় বলিতে বলিতে যায়। যথা "রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন, মৃদু মৃদু বংশী বাজে এই বৃন্দাবন।" যাহা হউক ঐ বালকদিগকে কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ না দিয়া থাকা যায় না। যাত্রীদিগকে এক দিন ব্রজবাসী-দিগের নিকট ভিক্ষা করার নিয়ম আছে, তাহারই নাম মাধুকরী। একদিন যাত্রীদিগকে বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ ও প্রধান প্রধান ঘাট সকলে স্নানাদি করিতে হয়। ঐ দিন ময়ূর ও বানরের জন্ত চাউল ভাজা এবং বুট ভাজা ইত্যাদি যাত্রীগণ সঙ্গে লইয়া, পথে পথে বানরদিগকে ও ময়ূরদিগকে দিয়া থাকে। ব্রজের ধূলা পরম পবিত্র বস্তু, তাহা সকলেই মস্তকে ধারণ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনের ন্যায় বানরের দৌরাত্ম্য আর কোথাও নাই। যাত্রীগণ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রতি-দিনই বানরের ভেটের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা পাত্রে চাউল ভাজা বুট ভাজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া গৃহে রাখে। বানরের ভয়ে সর্ব্বদাই গৃহের দ্বার এক প্রকার বদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়। বানরগণ সুযোগ পাই-লেই যাত্রীদিগের ঘটি, বাটি, কাপড় ইত্যাদি লইয়া বাড়ীর উপর তালায় বা নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করে, ঐ সময় যাত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকা পাত্রসহ চাউল ভাজাদি ভেট দিলে বানরগণ গৃহীত দ্রব্য প্রত্য-র্পণ করিয়া ঐ মৃত্তিকা পাত্রসহ চাউল ভাজাদি লইয়া যায়। কোন কোন বানর এরূপ দুষ্টপ্রকৃতি যে, দুই হস্তে পূর্ব্বোক্ত দুইটি ভেট না পাইলে গৃহীত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করে না। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যে সকল প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ নামে স্থাপিত আছেন, তাঁহাদের আরতির সময় এরূপ সুন্দর দেবভাবাপন্ন আশ্চর্য্য অনি-র্ব্বচনীয় রূপ দর্শন করা যায় যে, তখন বোধ হয় যেন শ্রীকৃষ্ণরাধিকা নিশ্চয়ই ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রজবাসী (পাণ্ডা-গণ) বঙ্গদেশ হইতেই যাত্রীদিগের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছামত যাইয়া থাকে, তৎকালে যাত্রীরা নিষেধ করিলেও শুনে না। তখন তাহারা অবৈতনিক চাকর স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বৃন্দাবন

না যাওয়া পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের নিকট কিছুই গ্রহণ করে না ও অত্যন্ত সৎব্যবহার করিয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইয়া যাত্রীদিগের ইচ্ছামত দুই এক ক্রোশ পরিভ্রমণ করাইয়া তাহারা স্বত্ব স্থাপন করে। তদনন্তর বিদায় করার দিন এরূপ বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে যে, যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব পাইলেও বোধ হয় সন্তুষ্ট হয় না। শ্রীবৃন্দাবনে শ্বেত প্রস্তরের দুইটি সুদৃশ্য বাড়ী আছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের দেবালয়ে যত প্রকার দেবসেবা আছে বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। দোলযাত্রা উপলক্ষে শ্রীবৃন্দাবনে উক্ত শেঠের একটি মেলা প্রায় বিশদিন পর্য্যন্ত থাকে। ঐ দোল উৎসবে যত অর্থ ব্যয় ও নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হয় আর কোথায়ও সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্য সুলভ মূল্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কেবল মাত্র মৎস্য পাওয়া যায় না।

পুষ্কর তীর্থ।

আজমিরের প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান সুপ্রসিদ্ধ পুষ্কর হ্রদকেই পুষ্কর তীর্থ বলে। ঐ তীর্থস্থানে স্নানাদি এবং পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে হয়। এখানকার পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের সহিত বিলক্ষণ ভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এস্থানে খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না।

হরিদ্বার, কনখল, চণ্ডীর পাহাড় এবং বদরিকাশ্রম।

আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের লুকসর ষ্টেসনে অবতরণ করত একটি শাখা রেলওয়ে-যোগে হরিদ্বার যাইতে হয়। হরিদ্বারই ঐ শাখা

রেলওয়ের শেষ ষ্টেসন। গোমুখ পর্ব্বত হইতে খরতর বেগবতী স্বর নদী গঙ্গা ভয়ানক বেগে হরিদ্বার হইয়া ক্রমশঃই দক্ষিণ মুখে গমন করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থানে গঙ্গার একটি শাখা (কাটিয়া) পঞ্জাবপ্রদেশে লইয়া গিয়াছেন। ঐ স্থানের গঙ্গা-প্রবাহের শব্দ শুনিলে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়। এথাকার গঙ্গাজল দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ এবং নির্ম্মল। ঐ গঙ্গায় স্নান করিলেই বোধ হয় যেন পতিতপাবনী মাতা সুরধুনী সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া লইলেন। তথায় ব্রহ্মকুণ্ড নামক একটি গঙ্গার ঘাটে যাত্রীগণ স্নান করিয়া তাহার দক্ষিণে আর একটি ঘাটে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিয়া থাকে। হরিদ্বার সমতল ক্ষেত্রের উপরে; তাহার উভয় পার্শ্বেই পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানের জল বায়ু এরূপ স্বাস্থ্যকর যে, বিনা ঔষধ সেবনেই অনেক রোগীকে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। এস্থানে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়, কেবল মাত্র মৎস্য পাওয়া যায় না। যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য অল্প ভাড়ায় বহুতর উত্তম ভাড়াটিয়া পাকা বাড়ী পাওয়া যায়। গঙ্গার উভয় তটে কাল ও শুভ্র বর্ণের ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থানের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের সহিত বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং প্রত্যুষে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য পর্ব্বতাবলির শোভা ঐ স্থানে যেরূপ দৃষ্ট হয় অন্য কোন স্থানে তদ্রূপ (শোভা) দেখা যায় না। শুভ্রবর্ণা প্রবলতরঙ্গিণী কলকলনাদিনী মাতা সুরধুনীর জলে পিণ্ড বা কোন প্রকার খাদ্য নিক্ষেপ করিলেই, মৎস্যগণ নির্ভয়ে ঐ জলের উপরে ভাসমান হইয়া খাইতে থাকে। ঐ সকল মৎস্য দেখিতে পরম রমণীয় বোধ হয়। এ স্থানে সর্ব্বনাথ

নামে একটি প্রধান শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। যাত্রীগণ তাঁহার ও অন্যান্য দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এ স্থানে বাঙ্গালি যাত্রী নিতান্ত অল্প। অত্রত্য পাণ্ডাগণ অত্যন্ত ভদ্রলোক, যাত্রী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক যাহা দক্ষিণা স্বরূপ দেয়, তাহাই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাশীধাম হইতে ডাক গাড়ীতে হরিদ্বার যাইতে প্রায় সাতাইশ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। অতএব ঐ স্থানে যাইতে রিটারণ্ টিকিট লইয়া না গেলে যাত্রীদিগের বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

চণ্ডীর পাহাড়।

হরিদ্বারের পূর্ব্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধান চণ্ডীর পাহাড় নামে একটি পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে প্রস্তরময় মন্দিরে চণ্ডী মাতার একটি প্রতিমূর্ত্তি আছেন। যাত্রীগণ তথায় যাইয়া দর্শন ও পূজা করিয়া থাকে। ঐ চণ্ডীর পাহাড়ে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য এমন কি জল পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। ঐ স্থানে লোকালয় নাই। যাত্রীগণ পূজার জন্য গঙ্গাজল এবং পুষ্পাদি সঙ্গে লইয়া যাইয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করার ভাল পথ নাই, সুতরাং দুর্ব্বল যাত্রিগণের তথায় যাওয়া সঙ্গত নহে। হরিদ্বার হইতে চণ্ডীর পাহাড়ে যাইতে পতিতপাবনী মাতা সুর-ধুনীর একটি নীলবর্ণের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নীল-ধারা বলে। দুগ্ধসন্নিভ গঙ্গাজল কি রূপে নীলবর্ণে পরিণত হইল,

তাহা কোনরূপেই বুঝিবার উপায় নাই, সুতরাং এইটি অতীব বিস্ময়-জনক ঘটনা।

কনখল তীর্থ।

হরিদ্বার হইতে এক ক্রোশ ব্যবধান সুপ্রসিদ্ধ কনখল তীর্থ। এই স্থানে পুরাকালে দক্ষরাজার রাজধানী ছিল। পাণ্ডাগণ এক্ষণেও দক্ষরাজের যজ্ঞস্থান দেখাইয়া থাকে। ঐ স্থানে বহুতর যোগী, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীগণ ঐ যজ্ঞস্থানে ও দক্ষেশ্বর শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বদরিকাশ্রম।

হরিদ্বার হইতে পোনের দিন পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বত ক্রমশঃ লঙ্ঘন করিতে পারিলে সুপ্রসিদ্ধ বদরিকাশ্রমে যাওয়া যায়। দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া ঐ তীর্থে যাওয়া যে গৃহী লোকের অসাধ্য বা নিতান্ত কষ্টসাধ্য কার্য্য * তাহা বলা বাহুল্য। ঐ স্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্ত্তি হরি বিরাজমান আছেন। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত যোগী ও তপস্বীগণ তথায় যাইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুঃসহ শীত ও তুষার রাশির প্রভাবে তথায় কোন মনুষ্যই যাইতে সক্ষম হয় না। প্রবাদ আছে, আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে ঐ বিষ্ণু মন্দিরের কপাট সহসা বদ্ধ হইয়া যায়। ঐ ছয় মাস কাল তথায় দেবর্ষি নারদ মুনি দ্বারবদ্ধ মন্দিরে অবস্থিতি করত ভগবান্ হরির পূজাদি করিয়া থাকেন। যাহা হউক যখন কোন মনুষ্যই উক্ত ছয় মাস মধ্যে তথায় যাইতে সক্ষম হয় না, তখন ঐ জনরব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার উপায় নাই। (ঐ তীর্থে যাইতে লছমন ঝোলা নামক একটি প্রসিদ্ধ লৌহময় সেতু পার হইয়া

---

* প্রত্যেক মনুষ্য এক শত টাকা ব্যয় করিতে পারিলে ঝাপানে অর্থাৎ শিবিকার ন্যায় যান বিশেষে হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম যাতায়াত করিতে পারে।

যাইতে হয়। † বদরিকাশ্রম যাইতে প্রায় ছয় ক্রোশ পরে পরে হিমালয়ের সমতল ক্ষেত্র সকলে এক একটি পান্থনিবাস আছে। তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায় কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক। পঞ্চাশ কি তদধিক লোক সমবেত হইয়া বদরিকাশ্রম যাওয়ার সাধারণ নিয়ম। কারণ পার্ব্বতীয় পথে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে, বহুলোক একত্র হইয়া গেলে ঐ ভয়ের নিবৃত্তি হয়। বৈশাখ মাসে যোগী ও সন্ন্যাসীগণ বদরিকাশ্রমে যাইয়া তুষার বিগলিত ভগবান্ বিষ্ণু মূর্ত্তি হরির মন্দিরে পূজাকৃত অবিশুষ্ক পুষ্পরাশি দেখিতে পান। তাহাতেই ঐ মন্দিরের দ্বার বন্ধ সময়ে দেবর্ষি মহামুনি নারদের পূজা করা সত্য বলিয়া উক্ত তপস্বীগণ বিশ্বাস করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

† লছমন নামা একজন মাড়য়ারি প্রধান ধনী কর্তৃক ঐ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ঐ সেতু লৌহস্তম্ভের উপর ঝুলান থাকা প্রযুক্ত, উহার নাম লছমন-ঝোলা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

জগন্নাথ, চন্দ্রনাথ এবং কামাখ্যা।

উড়িষ্যা দেশের অন্তর্গত সমুদ্রতটে পুরী জেলাতেই পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের মন্দির বিরাজমান আছে। জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা, এই তিন দেবদেবীর মূর্ত্তিই কাষ্ঠময়। রথযাত্রার সময় ঐ তিন দেবদেবীই রথে আরোহণ করিয়া থাকেন। এই সময় বহু-সংখ্যক যাত্রী দর্শনার্থে তথায় যাইয়া থাকে। এখানকার পাণ্ডারা সংখ্যাও অধিক। ঐ পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের সহিত নিতান্ত সদ্ব্যবহার করে না। দর্শন ও ভোগ দেওয়া এবং পিতৃলোকের পিণ্ডদান করাই এখানকার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তন্মধ্যে অন্নাদি ভোগ দেওয়ার নাম "আটিকা করা" বলে। ঐ আটিকার মূল্য যাত্রীর অবস্থানুসারে তারতম্য হইয়া থাকে। ঐ আটিকা করা বা ভোগ দেওয়া হইলে, যাত্রীগণ আপন ইচ্ছামত সবর্ণ অসবর্ণ সকল জাতিকেই অন্ন প্রসাদ মুখে দিয়া থাকে। ঐ প্রসাদ ভক্ষণ না করিয়া কাহারও নিস্তার নাই। সুতরাং তথায় হিন্দু মাত্রই একজাতির ন্যায় ব্যবহৃত হয়। রথের উপরিভাগে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, এইরূপ হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ থাকায়, দোলযাত্রার সময় অপেক্ষা রথযাত্রার সময় অধিক যাত্রী তথায় যাইয়া থাকে। কিন্তু রথযাত্রার

সময় তথাকার জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। কোন কোন যাত্রী পাণ্ডাদিগের উপদেশ মত সমুদ্রের ঢেউ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিম মন্দগিরির অপূর্ব্ব একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থল পথে পদব্রজে জগন্নাথদেব দর্শন করিতে যাওয়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য। সমুদ্রপথে অর্ণব যানে কলিকাতা হইতে যাইয়াও বহুযাত্রী সমুদ্রমধ্যে জাহাজ ডুবিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে। সমুদ্র মধ্যে একটি স্থানে দুর্গন্ধময় জলের আঘ্রাণেও বহুতর যাত্রী পীড়িত হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধা দূর করার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী কর্ডলাইনের আসনসোল ষ্টেসন হইতে যে একটি শাখা রেলপথ নাগপুর পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার আর একটি শাখা রেলপথ পুরুষোত্তম তীর্থ (পুরী) পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতেছে। এই রেলপথে গাড়ী চলিলে যাত্রীগণের জগন্নাথ দর্শন করার বিশেষ সুবিধা হইবে। এখানে সর্ব্ব প্রকারের খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়।

চন্দ্রনাথ বা বালোয়াকুণ্ড।

কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতে ৺ চন্দ্রনাথদেবের মন্দির বিরাজমান আছে। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করা পূর্ব্বে নিতান্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এক্ষণে অনেক সুবিধা হইয়াছে। শিবরাত্রির সময় ঐ অনাদি শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজার জন্য বহুযাত্রী যাইয়া থাকে। ঐ স্থানে যাইতে দক্ষিণ দেশীয় যাত্রীগণ গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত বাষ্পীয় জলযানে যাইয়া তদনন্তর নৌকায় মেঘনা-

নদী পার হইয়া পদব্রজে কিম্বা গো-শকটে শিবিকাতে ঐ তীর্থ স্থানে যাইয়া থাকে। ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে একটি উষ্ণ প্রস্রবণময় কুণ্ড আছে। সন্ন্যাসীগণ ইহারই নাম "বালোয়া কুণ্ড" বলিয়া থাকেন। এই স্থানে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করার নিয়ম আছে। এই তীর্থ স্থানে একজন মাত্র পাণ্ডা, তাহার উপাধি মহান্ত। ঐ মহান্ত পূর্ব্বে যাত্রীগণের নিকট বহু অর্থ গ্রহণ করিত, এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনে আর তাহার বিশেষ আধিপত্য নাই। যাত্রীগণ স্বেচ্ছামত যাহা দেয়, ঐ পাণ্ডা বাধ্য হইয়া তাহাই লইয়া থাকে। এস্থানে খাদ্য দ্রব্য ভাল পাওয়া যায় না। এখানকার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর। এখানে বাঁশের শিকড়ের এক প্রকার লাঠি বিক্রয় হয়, ঐ লাঠি অত্যন্ত শক্ত এবং দেখিতেও মন্দ নহে।

কামাখ্যা তীর্থ।

আসাম দেশের প্রধান জেলা গৌহাটির প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান নীল পর্ব্বতের উপরিভাগে অলৌকিক প্রস্তরময় মন্দির মধ্যে কামাখ্যা দেবী বিদ্যমান আছেন। ঐ স্থানে যোনি পীঠ দর্শন, স্পর্শ ও পূজা করাই সাধারণ নিয়ম। ঐ যোনি পীঠ একটি গহ্বর সদৃশ। ঐ গহ্বরটি সর্ব্বদা পর্ব্বতের প্রস্রবণে পরিপূর্ণ থাকে। মন্দিরের পাণ্ডাগণ ঐ যোনি পীঠ দর্শন করার জন্য প্রত্যেক যাত্রীর নিকট এক একটি টাকা লইয়া থাকে। ঐ যোনি পীঠ সর্ব্বদাই স্বর্ণ নির্ম্মিত একখানি আচ্ছাদন (পাত্র বিশেষ) দ্বারা ঢাকা থাকে। ঐ যোনি পীঠের নিকটেই চতুর্ভুজা জগজ্জননী সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মাতার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছেন। সাধারণ যাত্রীগণ তাঁহারই পূজা করিয়া

থাকে। আর একটী জলাশয়ে পিতৃলোকের পিণ্ডদান এবং স্নান তর্পনাদি করিতে হয়। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী আর একটি পর্ব্বত শিখরের উপরিভাগে মন্দির মধ্যে জগৎপিতা মহাদেব এবং বিশ্ব-জননী পার্ব্বতী দেবীর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছেন। ঐ মহা-দেবের নাম সকলেই তথায় উমানন্দ বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি আছে যে, যাত্রীগণ মধ্যে কেহ জারজ হইলে ঐ জারজ যাত্রী তাঁহার দর্শন পায় না। অর্থাৎ ঐ যাত্রী তথায় উপস্থিত হইলেই উমানন্দ মহাদেবের দ্বার রুদ্ধ হয়। এ স্থানের পাণ্ডাগণ উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীই আছে। এস্থানে যাত্রীগণের থাকিবার স্থান ও খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বেই একজন পাণ্ডার সঙ্গী না হইলে নূতন যাত্রীগণের পক্ষে ঐ সুবিধা ঘটে না। উত্তর রেলপথে যে সকল যাত্রী যায়, তাহাদিগকে ধুবড়ি জেলায় যাইয়া বাষ্পীয় জলজানে আরোহণ করত গৌহাটি যাইয়া অবতরণ করিতে হয়। ষ্টীমারে প্রায় ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল থাকিতে হয়। ঐ সময় মধ্যে কোন কোন স্থানে যাত্রীগণ স্নান ও জল পান করিবার উপযুক্ত সময় পাইয়া থাকে। জনরব আছে যে, অম্বুবাচীর সময় পূর্ব্বোক্ত যোনি পীঠ হইতে রক্ত স্রাব হয়, ঐ সময় মন্দিরের দ্বার বদ্ধ থাকে সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করার কথা কেহই বলিতে পারে না।

সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট।

স্বর্গাদি নির্ণয়।

সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যে পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়, সমুদ্র ও গিরি এবং কানন বেষ্টিত সেই স্থানকে পৃথিবী বলা যায়। উপরিভাগে তাবৎ পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও বর্ত্তুলাকারমিত অবকাশকে আকাশ বলা যায়। ভূমি হইতে লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্য অবস্থান করেন। সূর্য্য হইতে লক্ষ যোজন উপরে চন্দ্র অবস্থান করেন। চন্দ্র হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে শুক্রগ্রহ অবস্থান করিতেছেন। শুক্রগ্রহ হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে মঙ্গলগ্রহ অবস্থান করিতেছেন। ঐ মঙ্গল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে বৃহস্পতি গ্রহ আছেন। ঐ বৃহস্পতি হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরিভাগে শনৈশ্চর গ্রহ বিরাজমান আছেন। শনৈশ্চর হইতে লক্ষযোজন উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল অবস্থিত আছেন। ঐ সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উপরে ধ্রুব অবস্থিত আছেন। ধরণীতলে পাদচারে যে বস্তুর উপর গমন করা যায়, তাহাকে ভূলোক বলে। পরন্তু সমুদ্র, দ্বীপ, কানন, এ সকলকেও ভূলোক বলা যায়। ভূলোক হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত ভুবর্লোক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আদিত্য হইতে ধ্রুব লোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক

বা স্বর্গ কথিত হয়। * পৃথিবী হইতে এক কোটি যোজন উৰ্দ্ধে মহর্লোক বলা যায়। ভূলোক হইতে দুইকোটি যোজন উৰ্দ্ধে জনলোক আছে। ভূলোক হইতে চারি কোটি যোজন উৰ্দ্ধে তপলোক অবস্থিত। ক্ষিতি হইতে আট কোটি যোজন উৰ্দ্ধে সত্যলোক অবস্থিত আছে। ভূতল হইতে ষোড়শ কোটি যোজন উৰ্দ্ধে সত্যলোকের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ লোক অবস্থাপিত আছে। এই বৈকুণ্ঠলোকেই শ্রীপতি বিষ্ণুর নিবাস স্থান। ঐ কৈকুণ্ঠ লোকের ষোড়শ কোটি যোজন উৰ্দ্ধে শিবলোক বা কৈলাস পৰ্ব্বত অবস্থিত, সেই কৈলাসে পাৰ্ব্বতীর সহিত মহাদেব এবং গণেশ ও কার্ত্তিকেয় নন্দী প্রভৃতি পারিষদগণে বেষ্টিত হইয়া বিরাজমান আছেন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের অবস্থিতি প্রযুক্ত কৈলাস সৰ্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়।

---

* সূর্য্য লোকের উপরেই সহস্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী পুরী। পৃথিবীতে যে সকল মহিপাল নির্ব্বিঘ্নে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে পারে, সেই অমরাবতীতে ইন্দ্রাণীকে লাভ করিতে পারে।